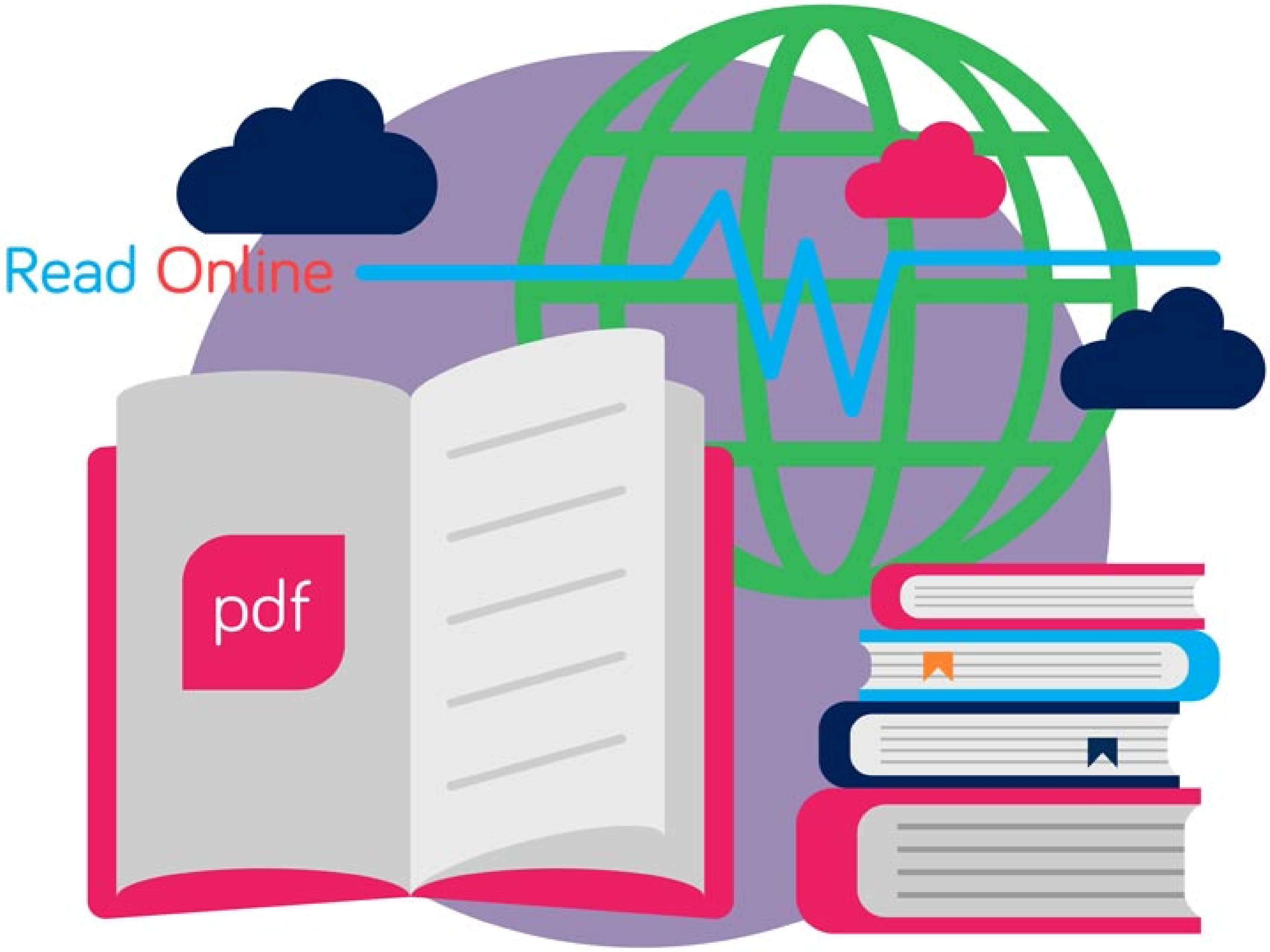

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

লজ্জা

তসলিমা নাসরিন

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৯৯
সংশোধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আগষ্ট, ১৯৯৬
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০০১
সর্বাধুনিক সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০২

প্রকাশক ঃ
বিভা রায়
পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ ঃ
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাঃ লিঃ
১২ বি, বেলেঘাটা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৫

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

দামঃ ১০০.০০

[illegible]382-97-[illegible]

www.BDeBooks.Com

১

সুরঞ্জন শুয়ে আছে, মায়া এসে বারবার তাড়া দিচ্ছে দাদা ওঠ, কিছু একটা ব্যবস্থা কর। সুরঞ্জন জানে এই ব্যবস্থার নাম কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকা। ইঁদুর যেমন গর্তে ঢোকে ভয়ে, ভয় কেটে গেলে বা পরিস্থিতি শান্ত হলে চারদিক দেখেশুনে লুকোনো জায়গা থেকে ইঁদুর যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে আসতে হবে তাদের। কেন তাকে নিজের ঘর ছেড়ে পালাতে হবে – তার নাম সুরঞ্জন দত্ত, তার বাবার নাম সুধাময় দত্ত, মায়ের নাম কিরণময়ী দত্ত, বোনের নাম নীলাঞ্জনা দত্ত, শুধু এই কারণে? এই কারণে তাকে আজ আলতাফ, কামাল বা লতিফের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে, যেমন নিয়েছিল দুবছর আগে? না, সুরঞ্জন এবার যাবে না। বাবা মা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন ঘরে, মায়া ছুটোছুটি করছে একবার বাবা মার ঘরে, একবার সুরঞ্জনের ঘরে। মায়া বোঝাতে চেষ্টা করছে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, আর দুর্ঘটনা ঘটে গেলে পরে দুঃখ করে লাভ নেই। দু'বছর আগে কামাল এসেছিল নিতে, বলেছিল বাড়িতে তালা দিয়ে সবাই আমার বাড়ি চল। কামালের চোখেমুখে ছিল উদ্বেগ, তাড়া দিচ্ছিল– চল চল দেরি করিস নে। কামাল তার অনেকদিনের বন্ধু। তবু আত্মীয়স্বজন নিয়ে কামালের বাড়িতে আশ্রয় কেন তাকে নিতে হয়! কামালকে তো ঘর ছেড়ে পালাতে হয় না, সুরঞ্জনকে কেন পালাতে হয়! এই দেশ কামালের যতটুকু, সুরঞ্জনেরও ঠিক ততটুকু। নাগরিক অধিকার দুজনের সমান হবারই কথা, অথচ সুরঞ্জন বোঝে কামালের মত সে উদ্ধত দাঁড়াতে পারে না, সে দাবি করতে পারে না আমি এই মাটির সন্তান, আমার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

আজ ডিসেম্বরের সাত তারিখ। গতকাল দুপুরে অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। করসেবকরা সাড়ে চারশ' বছরের পুরোনো একটি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের ঘোষিত করসেবা শুরুর পঁচিশ মিনিট আগে ঘটনাটি ঘটে। করসেবকরা প্রায় পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় তিনটি গম্বুজসহ সম্পূর্ণ সৌধটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। পুরো ঘটনাই ঘটে বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস, বজরং দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, পি.এ সি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে করসেবকদের অবিশ্বাস্য অপকাণ্ড দেখে। দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একটি গম্বুজ ভাঙা হয়, সাড়ে চারটায় দ্বিতীয় গম্বুজ, চারটে পঁয়তাল্লিশে তৃতীয় গম্বুজও ভেঙে ফেলে উন্মত্ত করসেবকরা। সৌধ ভাঙতে গিয়ে চারজন করসেবক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে শতাধিক।

সুরঞ্জন শুয়ে শুয়েই পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোয়। আজ ব্যানার হেডিং– বাবরি মসজিদ ধ্বংস, বিধ্বস্ত। বাবরি মসজিদ দেখেনি সুরঞ্জন, দেখবে কী, সুরঞ্জন অযোধ্যায় যায়নি কোনও দিন, দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি তার। সুরঞ্জন এটা মানে, ষোড়শ শতাব্দির এই স্থাপত্য কাজে আঘাত করা মানে এ কেবল ভারতীয় মুসলমানকে আঘাত

করা নয়, সমগ্র হিন্দুর ওপরও আঘাত, আসলে এ পুরো ভারতের ওপরই আঘাত, সমগ্র কল্যাণবোধের ওপর, সমবেত বিবেকের ওপর আঘাত।

কিন্তু এ কথা কাকে বোঝাবে? মায়া বলছে দাদা কিছু একটা ব্যবস্থা কর। সুধাময়ের ঘরে টেলিভিশন খোলা, ওরা সি এন এন দেখছে। সি এন এন অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলবার দৃশ্য দেখাচ্ছে। তা দেখুক ওরা, সুরঞ্জন দেখবে না। সুরঞ্জন আজ কোথাও যাবে না। সুরঞ্জন বুঝতে পারছে এ দেশেও বাবরি মসজিদ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড তাণ্ডব, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মন্দিরগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়বে, দোকানপাট লুঠ হবে। বিজেপির উস্কানিতে করসেবকরা বাবরি মসজিদ ভেঙে এসব দেশের মৌলবাদি দলকে আরও হৃষ্টপুষ্ট করেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি এবং তাদের সহযোগিরা কি তাদের উন্মত্ত আচরণের জের কেবল ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ভেবেছে? ভারতে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মরছে পাঁচশ ছশ একহাজার। ঘন্টায় ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। হিন্দুর স্বার্থরক্ষকরা কি জানে না যে অন্তত দুকোটি হিন্দু এই বাংলাদেশে আছে? শুধু বাংলাদেশে কেন, পশ্চিম এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশে হিন্দু রয়েছে, তাদের কী দুর্দশা হবে হিন্দু মৌলবাদিরা একবার ভেবেছে? রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির জানা উচিত ভারত কোনও বিচ্ছিন্ন জম্বুদ্বীপ নয়। ভারতে যদি বিষফোঁড়ার জন্ম হয় তার যন্ত্রণা শুধু ভারতই ভোগ করবে না, যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র বিশ্বে অন্তত প্রতিবেশি দেশগুলোয় তো সবার আগে।

সুরঞ্জন এই বাংলাদেশের মানুষ। ডাঃ সুধাময় দত্তের জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রী সুরঞ্জন দত্ত স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্র, পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে ঘরে বসে আছে, স্রেফ ঘরে বসে থাকা বলতে যা বোঝায় সুরঞ্জন তাই করছে। দুএকটি ফার্মে কাজ করেও ছেড়ে দিয়েছে, ভাল লাগেনি। ইচ্ছে ছিল পি এইচ ডি করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে, সে ইচ্ছেও নষ্ট হয়ে গেছে। তার আর সুখ-সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে না। সুরঞ্জন তার বাবার মধ্যেও এই যন্ত্রণা দেখেছে, তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসর হবার তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, সম্ভব হয়নি। পদোন্নতি হয়েছে সফিউদ্দিনের, সালাম তালুকদারের, কেবল সুধাময় দত্তের পক্ষেই সম্ভব হয়নি পদোন্নতির আবেদনের ফাইল নিয়ে মিনিস্ট্রিতে ছুটোছুটি করে কিছু একটা অর্জন করতে। কেরানীদের রুমে ডাঃ সুধাময় দত্ত আশায় আশায় বসে থাকতেন। ওরা বলত ডাক্তার বাবু আমার মেয়ের আমাশা হয়েছে, ভাল ওষুধ লিখে দিন তো। সুধাময় ওষুধ লিখে দিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, আমার কাজটি কবে হবে ফরিদ সাহেব? ফরিদ সাহেব এক গাল হেসে বলতেন, এসব কি আর আমাদের হাতে মশাই? অপেক্ষা করুন, দেখুন কি হয়, ফাইল তো সাধ্যমত নড়াচ্ছি। সুধাময় দত্তের রিটায়ারমেন্টের সময় চলে আসছে। তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন এসোসিয়েট প্রফেসর-এর একটি পদ লাভের জন্য। এ কোনও লোভ নয়, এ হচ্ছে প্রাপ্য, এই পদটি তাঁর এতদিনে প্রাপ্য হয়েছে, তার জুনিয়ররা তাঁরই মাথার ওপর বসে আছে। ফরিদ সাহেব বলতেন আজ নয় কাল আসুন। কাল এলে বলতেন পরশু আসুন। একমাস পর আসুন, পনেরোদিন পর আসুন। এই করে করে দেড় বছর যখন কাটল, পদোন্নতির আশা বাদ দিলেন সুধাময়। এর পর আর দেড় দুমাসের

www.BDeBooks.Com

মধ্যে তাঁর অবসর গ্রহণের দিনও এসে গেল। শেষ পর্যন্ত সহকারি অধ্যাপক হিসেবেই অবসর গ্রহণ করলেন সুধাময় দত্ত।

সুধাময় অবশ্য পরে বুঝেছিলেন মুসলমানের এই আবাসভূমিতে নিজের জন্য খুব বেশি সুযোগ সুবিধে আশা করা ঠিক নয়। ১৯৪৭ এ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এদেশের শাসক শক্তির পক্ষ থেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এটি মুসলমানের আবাসভূমি। সুধাময় মানেননি। শাসকশক্তি ও প্রশাসনের আচরণে অনেকেই ভাবতে বাধ্য হয়েছেন যে এ দেশে তারা নাগরিক হিসেবে সমমর্যাদা পেতে পারেন না। এর পর অনেকেই নিঃশব্দে দেশ ত্যাগ করেছেন। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু হালদার, নির্মলেন্দু ভৌমিক, রঞ্জন চক্রবর্তী সকলে। সুধাময় যাননি। অনেকেই বলেছিলেন সুধাময় চল, এ হচ্ছে মুসলমানের হোমল্যান্ড, এখানে নিজের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। নিজের জন্মের মাটিতে যদি নিশ্চয়তা না থাকে, নিশ্চয়তা তবে পৃথিবীর কোথায়? সুধাময় দত্ত বলেছিলেন, দেশ ছেড়ে পালাতে আমি পারব না। তোমরা যাচ্ছ যাও। এ আমার বাপ ঠাকুর্দার ভিটে। নারকেল সুপুরির বাগান, ধানি জমি, ষোলো বিঘার ওপর বাড়ি এসব ছেড়ে শিয়ালদা ষ্টেশনের উদ্বাস্তু হব এ আমার ইচ্ছে নয়। সুধাময় দত্ত থেকে গিয়েছেন দেশে। দেশভাগের চার বছর পর কিরণময়ীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। কিরণময়ী ছিল ষোল বছরের তরুণী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে, বাবা ছিলেন ব্যাংকের অফিসার। সুধাময় দত্ত কিরণময়ীকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিরণময়ীর গানের গলা ছিল চমৎকার।

এ কথা ঠিক– প্রশাসন, পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ বা পদোন্নতির ব্যাপারে বাংলাদেশে আইনের কোনও বাধা নেই কিন্তু দেখা যায় মন্ত্রণালয়-গুলোয় কোনও সেক্রেটারি বা এডিশনাল সেক্রেটারি পদে কোনও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নেই। জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন একজন, আর হাতে গোনা কজন আছেন ডেপুটি সেক্রেটারি। সুধাময়ের বিশ্বাস সেই একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কয়েকজন ডেপুটি সেক্রেটারি নিশ্চয় পদোন্নতির আশা করেন না। ছয় জন মাত্র হিন্দু ডিসি আছেন সারা দেশে। পুলিশের নিচু পদে হয়ত তাদের নেওয়া হয় কিন্তু এসপি পদে হিন্দু কজন আছেন? সুধাময় ভাবেন আমি আজ সুধাময় দত্ত বলেই আমার এসোসিয়েট প্রফেসর হবার পথে এত বাধা আমি যদি মোহাম্মদ আলী অথবা সলিমুল্লাহ চৌধুরী হতাম তবে নিশ্চয় এই বাধা থাকত না। সুধাময় দত্ত জানেন ফরেন সার্ভিসে হিন্দু নেই। হাইকোর্টে হিন্দু জজ মাত্র একজন। সেনাবাহিনীতে মাত্র ছয়জন কমিশন প্রাপ্ত অফিসার। কর্ণেল মাত্র একজন, বাকিরা মেজর। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলেও মুসলমান অংশীদার না থাকলে কেবল হিন্দু প্রতিষ্ঠানের নামে সব সময় লাইসেন্স পাওয়া যায় না। তাছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক, বিশেষত শিল্পঋণ সংস্থা থেকে শিল্পকারখানা গড়বার জন্য ঋণ দেওয়াও হয় না।

সুরঞ্জন বিষম টানাপোড়েনের মধ্যে বড় হয়েছে। সে সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দেশভাগ দেখেনি, পঞ্চাশের দাঙ্গা দেখেনি। তার জন্ম আটান্ন কি উনষাটে। সে তার বাবার দেশপ্রেমের ওপর আচমকা একটি বালির বস্তা দেখেছে মুখ থুবড়ে পড়তে। বাহান্নোর আন্দোলনের সময় ছাত্র ছিলেন, তিনিও মিছিল করেছেন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" বলে ঢাকার

রাস্তায় শুধু রফিক সালাম বরকতের নয়, মিছিলে সুধাময়েরও পায়ের ছাপ আছে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন, সারা শরীরে টগবগ করে নাচছে আন্দোলনের আনন্দ। 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল সাহসী ও সচেতন বাঙালি তরুণেরা। তারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিনত, ন্যুজ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, পুলিশের গুলির মুখে যুবকেরা ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করেছে, কিন্তু কেউ দাবি ছাড়েনি, রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা করবার অনমনীয় যৌক্তিক দাবি। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে কিরণময়ী তাঁকে ঘরে আগলে রাখতে পারেনি। কিরণময়ী যেতে দিত না তাঁকে বাইরে, বলত– মিছিলে ওরা গুলি ছোঁড়ে, তুমি যেও না। সুধাময় দত্ত বায়ান্নোর আন্দোলনে ছিলেন, তিনি ঊনসত্তরে ঘরে বসে থাকবার মানুষ নন। আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশবাহিনী তখন বাঙালির মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়, গুলি ছোঁড়ে। এগার দফার দাবি নিয়ে বাঙালি তখন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আবারও ক্ষিপ্ত হয়েছে।

একাত্তরের মার্চে সুধাময় তখন ময়মনসিংহে, ঢাকা মেডিকেলে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে চাকরি করতে ময়মনসিংহে গেছেন, নিজের এলাকায়। শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ রেসকোর্সে বসে শোনা হয়নি। আট তারিখ বিকেলে ঢাকা থেকে শরিফ, বাবলু, ফয়জুল, নিমাই ফিরে এসে চোখমুখ লাল, প্রচণ্ড উত্তেজনা শরীরে ও মনে, সুধাময়ের স্বদেশী বাজারের ফার্মেসীতে ঢুকে বলল, মুজিব বলেছেন—আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার ভাইদের হত্যা করা হয়, তবে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। বলতে বলতে শরিফরা উত্তেজনায় কাঁপছিল। সুধাময় শরিফের হাত ধরে রেখেছিলেন মুঠোর মধ্যে। তবে কি আমরা এখন যে কোনও আন্দোলন বা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হব? সুধাময়ের এই প্রশ্নের জবাব ওরা দিয়েছিল— নিশ্চয়।

যেদিন শরীফ বাবলুর সঙ্গে তাঁর শহর ছেড়ে চলে যাবার কথা, কিরণময়ী আর সুরঞ্জনের থাকবার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল সুধাময়, সেদিনই নিমাই এসে বলল— ওরা হিন্দু ধরছে সুধাময়, পালাই চল।

পালাব?

হ্যাঁ পালাব।

তবে যুদ্ধে যাবার কথা? সকলেই তো দেখি যুদ্ধে যাচ্ছে। জামাল, রশিদ মনজুর চলে গেছে। ইদ্রিস, সাবের, ফরহাদ ওরা সবাই গেছে। এতদিন রুদ্ধদ্বার বৈঠক হল আমরা যুদ্ধে যাব, ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নেব। কিরণময়ী এখানে ফয়জুলদের বাড়ি থাকবে। তার কি হবে তবে?

সময় নেই সুধাময়। এখনও সিদ্ধান্ত নাও কী করবে। দেরি করলে বিপদ হতে পারে। নিমাই চলে গেল।

সুধাময় বিপদের কথা ভাবেননি। কিরণময়ীকে ফয়জুলদের বাড়ি রেখে সুধাময় চলেই যাবেন ভাবছেন, কিরণময়ীকে কিছু জানাননি, তিনি যুদ্ধে যাবেন কিরণময়ী এটি

www.BDeBooks.Com

মেনে নেবে না। ফয়জুলদের গ্রামের বাড়ি ফুলপুর, সেখানে দু ছেলেমেয়ে নিয়ে কিরণময়ী থেকে যাবে আর সুধাময় চলে যাবেন এই নির্মম সিদ্ধান্ত কিরণময়ী কী করে মেনে নেবে! ফয়জুলের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার মা বাবা কিরণময়ীকে আশ্রয় দেবে। ফয়জুলও যাচ্ছে যুদ্ধে। কী ভীষণ উত্তেজনা তখন সুধাময়ের। প্রিয় কিরণময়ী, সুরঞ্জন, মাত্র ছ'মাস বয়সের মায়া সবই তুচ্ছ হয়ে গেল দেশের স্বাধীনতার কাছে।

শহর ছেড়ে মানুষ চলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। ফাঁকা হয়ে আসছে রাস্তা, যানবাহন মানুষজন কম চলছে। কিরণময়ী বলছে চল ইন্ডিয়া যাই, হিন্দুদের ধরে ধরে মারছে, পড়শি যারা হিন্দু ছিল, কেউ নেই, সবাই ইন্ডিয়া চলে গেছে। তুমি পড়ে আছ কিসের আশায়?

সুধাময় পালাবেন না এরকমই ভেবেছিলেন। নিমাই তার আত্মীয়-স্বজনসহ পালিয়েছে ভারতে। সুধাময় বাড়ির দরজায় লাগাবার জন্য দুটো তালা যোগাড় করে বললেন, টাকাপয়সা আর তোমাদের কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে নাও।

আর তুমি? কিরণময়ী জিজ্ঞেস করল।

এই বাড়ি পাহারা দিতে হবে না? এত বড় বাড়ি।

সুধাময়ের বাড়ি আসলেই বেশ বড়। ব্রাহ্মপল্লীর বড় মাঠ বড় পুকুরঅলা বাড়ি এই একটিই। বাড়ির চারদিকে সার বেঁধে সুপুরি গাছ। সদর গেট খুলে ঢুকলেই ফুলের বাগান। গাছ গাছালি ঘেরা বাড়িটি পুরোনো স্থাপত্যের। সুধাময় ছিলেন বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা ছিলেন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সুধাময়ের ঠাকারদা ছিলেন শশিকান্ত জমিদারের নায়েব। বাড়িটি তাঁরই বানানো সম্ভবত। অথবা কেনা।

কিরণময়ী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমাকে ফয়জুলের মা বললেন আমার নাম যেন ফাতেমা আখতার বলি, শাঁখা সিঁদুর পরতে মানা করলেন।

সুধাময়ের বুকের মধ্যে সেই প্রথম ধক করে একটি শব্দ হল।

কেন তোমার নাম ফাতেমা আখতার হবে? তোমার নাম কিরণময়ী। কিরণময়ী দত্ত।

সুধাময় বললেন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহের একটি কাঁটা বিঁধে রইল। তবে কি সত্যিই হিন্দু বলে তাঁরা এখন লাঞ্ছিত হবেন বেশি, তাঁদের ওপর নির্যাতন একটু বেশিই হবে? সুধাময় অবশ্য খবর পাচ্ছেন যাদের যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা, যাদের গুলি করছে, নির্বিচারে মেরে ফেলছে ওরা সবাই হিন্দু নয়, মুসলমানই বেশি। কিরণময়ীকে এখানে রেখে যাওয়া কি নিরাপদ নয়, ফয়জুল কবীরের বাড়িতে! শহর ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সুধাময় স্থির করতে পারছেন না তিনি কি করবেন। তাঁর ধুতি পরবার অভ্যেস। পাশের বাড়ির আলম সাহেব বললেন, ধুতি ছেড়ে দিন, ধুতি পরা ঠিক নয় এখন।

ধুতি পরা ঠিক নয়। কিণময়ীর নাম ফাতেমা আখতার। সুধাময় এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি এবং তাঁর পরিবার হিন্দু সম্প্রদায়ের; এবং সে কারণেই তাঁর ভবিষ্যৎ এবং ফয়জুল, আলম বা সলিমুল্লাহর ভবিষ্যৎ এক নয়, কিছুটা ভিন্ন। রাস্তায় বেরোলে যে অল্প কজন বাঙালি চোখে পরে ওরা মাথায় টুপি পরে। সুধাময় প্যান্ট সার্ট ছেড়েছেন

অনেকদিন। ধুতিতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশি। ফয়জুল বিকেলে দুটো পাজামা দিয়ে গেল, বলল, এটি পরে নেবেন, আমি সন্ধ্যায় আসব। সন্ধ্যায় ওদের ফুলপুর পাঠিয়ে দিয়ে শরীফ, বাবলু, ফয়জুল আর সুধাময় নালিতাবাড়ি পার হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে যাবেন— এরকমই কথা হল। সুধাময় বিকেলে রাস্তায় বেরোলেন শহরের অবস্থা দেখতে। বেশি দূর যেতে পারেননি, চরপাড়ার মোড়ে তার পথরোধ করল মিলিটারিরা। জিজ্ঞেস করল নাম কি?

নাম? সুধাময় ভাবলেন কি নাম আমার? সুধাময় দত্ত? বাবার নাম সুকুমার দত্ত? ঠাকুরদাদার নাম জ্যোতির্ময় দত্ত? সুধাময়ের জিভ ভারি হয়ে এল। ওরা আবার নাম জিজ্ঞেস করল। সুধাময় জানেন না সুধাময়ের কণ্ঠ থেকে অবচেতনেই বেরোল 'সিরাজউদ্দিন হোসেন'। গলা কাঁপল খানিক।

ওরা সংখ্যায় তিনজন ছিল। হাঁটছিল। শ্মশানের মত শহরটি। দোকানপাট বন্ধ। সুনসান। ওরা সুধাময়ের বাহু ধরে রাখল শক্ত করে। বলল, খোল দেখি, লুঙ্গি খোল। লুঙ্গি সুধাময় খোলেননি। ওরাই খুলেছিল টান মেরে। সুধাময় লজ্জায় ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন। ওরা খুলে প্রথম লাথি লাগাল সুধাময়ের পেটে। পেট চেপে সুধাময় বসতে যাবেন উবু হয়ে, হঠাৎ পেছন থেকে আরও এক লাথি পড়ল পিঠের ওপর। সুধাময় না পারলেন দাঁড়াতে, না বসতে। ওরা কাছেই একটি ক্যাম্পে নিয়ে গেল সুধাময়কে। কী মাস তখন, সুধাময়ের মনে নেই—এপ্রিল? মে? জুন? ভাবতেই তাঁর শরীরের ভেতর তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে অন্ধকার হয়ে যায় জগৎ। সুধাময়ের মনে পড়ে না ক্যাম্প কতদূর ছিল, ক্যাম্পে কী হয়েছিল তাকে নিয়ে। সুধাময় এইটুকু জানেন যে তিনি শেষ অবধি বেঁচে ফিরেছেন।

আর যুদ্ধে যাওয়া হয়নি সুধাময়ের। ভারত যাওয়াও হয়নি। শরীফ, বাবলুরা একা চলে গিয়েছিল। ফয়জুলের বাড়িতে কিরণময়ী, সুরঞ্জন আর মায়াকে নিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত পড়ে ছিলেন সুধাময়। শহরের বাড়িটিতে দরজায় তালা কেবল। সুধাময়ের মাঝেমধ্যে অবাক লাগে ওরা তাকে মেরে ফেলেনি কেন? শহরের রাস্তায় আস্ত একটি হিন্দু পেয়ে ওরা শুধু বেয়নেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কষ্ট দিল আর হা হা করে হাসল। রাইফেলের বাট দিয়ে ডান পাটা ভেঙে দিল, ব্যাস? আর কিছু নয়? অবশ্য আর একটা অঙ্গহানি ওরা ঘটিয়েছে। সুধাময় এই কথা প্রাণপণে গোপন করতে চান। সেদিন ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরে সুধাময় বলেছিলেন– বাঁচতে হলে কিরণময়ী আজ তুমি বরং খুলেই ফেল শাঁখা। কিরণময়ী কেঁদে উঠেছিলেন। সুধাময় নিজের হাতে কিরণময়ীর শাঁখা খুলে, সিঁদুর মুছিয়ে কালিবাড়ি ফেরি ঘাটের দিকে গিয়েছিলেন।

যাবেন ফুলপুর।

কিরণময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়ির কি হবে?

খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে অসুস্থ শরীরে সুধাময় শহর ছাড়লেন। দেশের মায়ায় পড়ে তিনি শরণার্থী হয়ে ভারত যাননি। যুদ্ধে যাবার দিনই তাঁকে মেরে খোঁড়া করে দেওয়া হল। তাঁর যুদ্ধে যাওয়াও হল না। ফুলপুর পালিয়ে এসে ভাঙা পা নিয়ে ফয়জুলের বাড়িতে অসুস্থ পড়ে রইলেন। নিজের পা নিজেই প্লাষ্টার করে শুয়ে ছিলেন অনেকদিন। কিরণময়ীর নাম হল ফাতেমা আখতার। সুধাময়ের নাম আব্দুস সালাম, সুরঞ্জন আর মায়ারও নাম পাল্টে সাবের আর ফারিয়া করা হল। ছ'মাসের বাচ্চা, তারও নাম বদল হল।

www.BDeBooks.Com

ভারত ভাগের পর দেশত্যাগ বাড়েছে দেশের প্রচুর হিন্দু। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান ভাগ হবার পর সংখ্যালঘুদের জন্য সীমান্ত খোলা ছিল। সে সময় প্রচুর হিন্দু বিশেষত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ভারতে চলে যান। ১৯৮১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১২.১ শতাংশ। গত ৮ বছরে এ সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয় সোয়া থেকে দেড় কোটিতে দাঁড়িয়েছে। তবে এ অনুমান সরকারি গণনানির্ভর। সুধাময়ের মনে হয় লোকগণনাতেও বৈষম্য দেখানো হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। ২ কোটির মত। মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হিন্দু আছে দেশে। তবে একথা সত্য এদেশে হিন্দুসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ১৯০১ সালের হিসেব বলে এদেশে হিন্দু ছিল ৩৩.১ শতাংশ। ১৯১১ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ। ১৯২১ সালে ৩০.৬ শতাংশ, ১৯৩১ সালে ২৯.৪ শতাংশ, ১৯৪১ সালে ২৮ শতাংশ। ৪১ বছরে ভারত ভাগের আগে হিন্দু কমে ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ৪০ বছরে যা হ্রাস পায়নি, ১০ বছরে তার চেয়ে বেশি হ্রাস পেল। পাকিস্তান আমল জুড়ে হিন্দুরা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে ভারতে। ১৯৬১ সালের হিসেবে হিন্দু সংখ্যা ১৮.৫ শতাংশে দাঁড়ায়, ১৯৭৪ সালের হিসেব ১৩.৫ শতাংশে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর হিন্দুসংখ্যা হ্রাসের হার কমে যায় অনেকটা বিভাগপূর্ব কালের মত। ১৯৭৪ সালে হিন্দু জনসংখ্যার হার ১৩.৫ শতাংশ, ১৯৮১ সালে যদি ১২.১ শতাংশ হয়, তবে তো এ নিশ্চয় করে বলা যায় যে, সংখ্যালঘুরা ভিটে ছাড়ছে আগের চেয়ে কম। কিন্তু কত সাল অবধি এই সংখ্যা কম? তিরাশি, চুরাশি, পঁচাশি, ঊননব্বই, নব্বই? নব্বই-এর পর কি হিন্দুসংখ্যা হ্রাস পাবে না দেশে? বিরানব্বই-এর পর?

সুধাময় এখন প্রায় বৃদ্ধ। তিনি সুরঞ্জনের কথার মূল্য দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সুরঞ্জন আজ তাদের বাড়ির বাইরে নেবে, কোথাও লুকিয়ে থাকবার জন্য। একাত্তরে সুধাময়ের ব্রাহ্মপল্লীর বাড়িতে কিছুই ছিল না। ডিসেম্বরের শেষে ফুলপুর থেকে ফিরে এসে সুধাময় দেখেছিলেন বাড়ির খোপে খোপে কিছু কবুতর বাসা বেঁধেছে। দু একটা শীর্ণ কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কিছু নেই সারা বাড়িতে, ধুলো ছাড়া। ইট খুলে নিয়ে যেতে পারেনি তাই বিল্ডিং-এর গাঁথুনিতে ইটগুলো থেকে গেছে। তবু নতুন দেশে নতুন করে বেঁচে থাকবার আশায় সুধাময় আবার ঘরদোর পরিষ্কার করলেন। বললেন, কিরণময়ী, তুমি মন খারাপ ক'রো না। নতুন দেশ তো, ভাঙচুর লুটপাট কত কোথাও হয়েছে দেখ, সবাই নতুন করে গড়ে তুলছে সব। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। পরে দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিরণময়ী প্রতিবেশিদের তুলনা দিল, কই, ওদের বাড়ি তো লুঠ হয়নি। বেছে বেছে আমাদের কেন? শওকত সাহেব, দবির সাহেবরা তো শহর ছেড়ে কোথাও যাননি।

আমাদের দরজায় স্রেফ একটা তালা ঝুলছিল। তাই বোধহয় ভেঙে ঢুকেছে– সুধাময় বললেন কিন্তু তাঁর মনে আবার এক সন্দেহের কাঁটা বিঁধে রইল। ডিসেম্বরের আঠারো তারিখ যখন শহরে ফিরলেন, ব্রাহ্মপল্লীর মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শওকত হোসেন। তিনি যেন কিছু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এতদিন পর দেখা, অথচ পাশ কেটে চলে গেলেন। তাঁরা কি কেউ আশা করেননি সুধাময়রা একদিন ফিরে আসবেন?

পঁচাত্তরে ব্রাহ্মপল্লীর বাড়ি বিক্রি করে ঢাকায় ঝাড়ি ভাড়া নিয়ে সুধাময় নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন। এই বাড়িও তছনছ হয়েছে। লুঠ হয়েছে। পুড়েছে। নব্বই-এর তিরিশ ও একত্রিশে অক্টোবর তারিখে কী বিভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে দেশটিতে। সুধাময় কি আরেকবার স্মরণ করবেন কী ঘটেছে সেই দুটো দিনে? হ্যা স্মরণ করবেন, তবে আপাতত সুরঞ্জনের একটি পরামর্শ প্রয়োজন। সুরঞ্জন এই দুর্যোগের দিনে কোথাও তো তাদের নিতে পারে অন্তত প্রাণে বাঁচবার জন্য। বাড়ি লুঠ হয় হোক। কী আছে আর বাড়িতে। দু বছর আগে সবই তো আগুনে পোড়ানো হয়েছে। সম্পদশালী সুকুমার দত্তের সম্পদ বলতে তাঁর পুত্র সুধাময় দত্তের জীবন আর সুধাময়ের দু'সন্তান। এ ছাড়া আর কোনও ধনসম্পদ সুধাময়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি আগলে রাখা।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, চৌষট্টির সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টির আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এ কথা প্রমাণ করেছে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের কারণে দেশভাগ হওয়া ছিল ভুল একটি সিদ্ধান্ত। আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন— It is one of the greatest frauds on the people to suggest the religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political forntiers. History has however proved that after the first few decades or at the most after the first century, Islam was not able to unite all the muslim countries on the besis of Islam alone. জিন্নাহও জানতেন দ্বিজাতিতত্ত্বের অসাড়তার কথা। মাউন্টব্যাটেন যখন পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ করবার পরিকল্পনা করছিলেন। তখন জিন্নাহ বলেছিলেন— A man is Punjabi or a Bengali before he is Hindu or Moslem. They share a common history, language, culture and economy. You must not divide them. You will cause endless bloodshed and trouble.

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি Endless bloodshed and trouble দেখেছে যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এক লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা একথা প্রমাণ করেছে যে, ধর্ম কখনও জাতিসত্তার ভিত্তি নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাসই জাতি গঠনের ভিত্তি পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের একজাতিত্ব একদিন পাকিস্তান এনেছিল সত্য কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা ভেঙে এদেশের বাঙালিরা দেখিয়ে দিয়েছে তারা পাকিস্তানের মুসলমানের সঙ্গে আপস করেনি।

হিন্দুরা আশা করেছিল স্বাধীন অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দেশের

www.BDeBooks.Com

কাঠামো থেকে ধসে পড়ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। সংসদে অষ্টম সংশোধনি বিল পাশ হয়ে গেল, রাষ্ট্রধর্ম বিল। এদেশের রাষ্ট্রধর্ম এখন ইসলাম। যে মৌলবাদি দলটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, আর দেশ স্বাধীনের পর গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল, তারা আজ গর্ত থেকে মাথা বের করেছে। তারা আজ সদর্পে ঘুরে বেড়ায়, মিছিল মিটিং করে, তারাই নব্বই এর অক্টোবরে হিন্দুর মন্দির, ঘরবাড়ি লুটপাট করে ভেঙে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সুধাময় মাথা নিচু করে বসে আছেন। এবার কী হবে তিনি জানেন না। বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে উগ্র উন্মত্ত হিন্দুরা। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সুধাময়রা মৌলবাদি মুসলমানের থাবা থেকে নব্বই-এ মুক্তি পায়নি, বিরানব্বই-এ পাবে কেন? এবারও সুধাময়দের ইঁদুরের গর্তে লুকোতে হবে, শংকা কেটে গেলে পরে বেরোতে হবে। সুধাময় হঠাৎ কেঁপে ওঠেন আশংকায়, তিনি কি এই মাটির সন্তান, যে মাটিতে আছে তাঁর জন্মগত অধিকার? তবে কেন এই দেশেই তাঁর প্রতিবেশির ভয়ে তাঁকে লুকোতে হয়? হিন্দু বলে? যেহেতু হিন্দুরা ওখানে মসজিদ ভেঙেছে। এই দায় কেন সুধাময়ের হবে! হঠাৎ সুধাময় কঁকিয়ে ওঠেন যন্ত্রণায়। কিরণময়ী তাঁকে শুইয়ে দেন বিছানায়। মায়া অস্থির পায়চারি করছিল বারান্দায়। সে বাবার ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, তোমরা তবে এখানেই পড়ে থাক, আমি যাচ্ছি।

কিরণময়ী জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি?

যাব, দাদা সটান শুয়ে আছে, সে পেপার পড়ছে। তোমরা স্মৃতিচারণ কর বসে বসে। আমার বেঁচে থাকা জরুরি। আমি যাচ্ছি। দেখি পারুল নয়ত রিফাতদের বাড়ি বসে থাকি গিয়ে।

আর তোর নীলাঞ্জনা দত্ত নামটিকে কি করবি? সুধাময় চোখে মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

মায়া বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ বললে নাকি মুসলমান হওয়া যায়, তাই হব, নাম হবে ফিরোজা বেগম।

মায়া! কিরণময়ী ধমকে উঠলেন। সুধাময় শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন একবার মায়ার দিকে, একবার কিরণময়ীর দিকে। মায়া সাতচল্লিশের দেশভাগ দেখেনি, পঞ্চাশের দাঙ্গা দেখেনি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, বুদ্ধি হবার পর দেখেছে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, দেখেছে নব্বই এর বিভৎস আগুন, জীবন বাঁচাতে মায়া এখন যে কোনও চ্যালেঞ্জে যেতে প্রস্তুত।

সুধাময়ের দৃষ্টির শূন্যতা মায়াকে গ্রাস করে নেয়। তাঁর সামনে মায়া বলে আর কেউ থাকে না, মায়াকে একটি গোলকধাঁধার মত মনে হয়। সুধাময়ের বুকের ভেতর তীব্র একটি যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

মায়া সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। সে পারুলের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু সুধাময়ের কী হবে, অথবা কিরণময়ীর? সুরঞ্জনও যে কোনও দিকে চলে যেতে পারে।

সুধাময় এখন আর ধুতি পরেন না। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত নিয়মিত পরতেন। এরপর বাড়ির পাশের দরজি দিয়ে গোটা পাঁচেক পাজামা বানিয়ে নিলেন। এরপর থেকে পাজামাই পরছেন, পাজামার ওপর লম্বা সার্ট। কিরণময়ীও আর আগের মত মোটা সিঁদুর

পরে না, কপালে সিঁদুরের টিপ পরা– সেও বন্ধ হয়েছে। হাতের শাঁখাদুটো আছে কেবল। একাত্তরে স্ত্রীর শাঁখাসিঁদুর খুলে ফেলেছিলেন সুধাময়। স্বাধীন বাংলাদেশে খুলে রাখা শাঁখাসিঁদুর আবার নতুন করে পরতে শুরু করেছিল। কিরণময়ী। কিন্তু দিন দিন কিরণময়ী বুঝতে পারে এতে জাত রক্ষা হচ্ছে বটে তবে মান রক্ষা হচ্ছে না।

সুরঞ্জন ঘর থেকে বেরোয়। বেরিয়ে সে প্রথম টিভিটি অফ করে। বাথরুমে যায়, দাঁত মাজে। মুখ হাত ধুয়ে সুধাময়ের বিছানায় পা তুলে আরাম করে বসে। কিরণময়ী ছেলের জন্য চা নিয়ে আসে। বাড়িত অদ্ভুত এক থমথমে ভাব। যেন কেউ মরেছে এইমাত্র। বাবা ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন না, ছেলে তার মা'র সঙ্গে নয়; সুরঞ্জনও টের পেয়েছে মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য বেরোবার আগে সে অনেক চেষ্টা করেছে সকলকে বোঝাতে যে, যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মায়া সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে গেছে তার নাম ফিরোজা বেগম হলে তার কোনও অসুবিধে নেই। সুরঞ্জন জানে মায়ার সঙ্গে জাহাঙ্গীর নামের এক ছেলের প্রেম, তাই বড় সহজে সে ফিরোজা বেগম নামটি উচ্চারণ করতে পারে জাহাঙ্গীর ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, মায়ার দু'ক্লাস ওপরে। ওরা সম্ভবত বিয়েও করে ফেলবে একসময়। সুরঞ্জন ভাবে মায়াই বেশ আছে, ধর্ম কর্ম করে না, ওসবে বিশ্বাসও নেই। কিন্তু প্রেমে যে সে এমন নিমগ্ন, ছেলেটি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে তো! সুরঞ্জন তার নিজের জীবন দিয়ে বোঝে, পারভিনের সঙ্গে শেষ অবধি বিয়ে হয় হয় করেও তার হয়নি। পারভিন বলেছিল তুমি মুসলমান হও। সুরঞ্জন বলেছিল ধর্ম পাল্টানোর প্রয়োজন কী বল, তার চেয়ে যার যা ধর্ম তাই থাকুক। যার যা ধর্ম তাই থাকবার ব্যবস্থাটি পারভিনের পরিবারের মনঃপুত হয়নি। তাঁরা পারভিনের সঙ্গে একটি ব্যবসায়ীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। পারভিনও কেঁদে কেটে বিয়ের পিঁড়িতে বসল।

সুরঞ্জনের দিকে সুধাময় সেই একই শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। তিনি কি ভুল করেছেন ভারত না গিয়ে? যতবার ভারত যাবার পথ খোলা হল, ততবারই তিনি সে পথ নিজেই বন্ধ করে দিয়েছেন। ভারত চলে গেলে অবস্থা পাল্টাত নিশ্চয়। এভাবে ছেলের মুখের দিকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে হত না। সুরঞ্জনও বেশ নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি এভাবে সে কিরণময়ীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিল, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, ডিসেম্বর চলে এল, শীত তেমন পড়েনি মনে হয়, মনে আছে শীতের ভোরে ছোটবেলায় খেঁজুরের রস খেতাম।

কিরণময়ীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ভাড়া বাড়ি, খেঁজুর গাছ কোথায় পাবি। নিজের হাতে লাগানো সব গাছগাছালির বাড়ি তো জলের দরে বিক্রি করে এলাম। ব্রাহ্মপল্লীর বাড়িতে কিরণময়ীর হাতে লাগানো গাছের মধ্যে খেজুর গাছও ছিল। সুরঞ্জন পছন্দ করত খেঁজুরের রস। রসের হাঁড়ি নামিয়ে আনত গাছ কাটার লোক, সুরঞ্জন আর মায়া নিচে দাঁড়িয়ে দেখত। এই দৃশ্য কিরণময়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সুরঞ্জনের উদাস চোখেও একই দৃশ্য।

বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন সুধাময় দত্ত। মায়ার যখন ছ বছর বয়স তখন মায়াকে স্কুল থেকে বাড়ি আসবার পথে কারা যেন ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কারা, সুরঞ্জন জানত কারা ওরা। এডওয়ার্ড স্কুলের গেটে আড্ডা দিত কিছু ছেলে, পকেটে ধারালো ছোরা নিয়ে ঘুরত, ওরাই, সুরঞ্জন অনুমান করত ওরাই এই কাণ্ডটি করেছিল।

www.BDeBooks.Com

মায়াকে দুদিন আটকে রেখেছিল একটি ঘরে। দুদিন পর মায়া ঘরে ফিরে এসেছিল, একা একা হাঁটতে হাঁটতে। কোত্থেকে এসেছে, কারা ধরে নিয়েছিল, কিছু বলতে পারেনি। মায়া অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল পুরো দুমাস। মানুষ দেখে ভয় পেত। চিৎকার করে উঠত মাঝরাতে, ঘুমের মধ্যে। এর পর পরই সুধাময় সিদ্ধান্ত নেন তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে, নিজের শহর ছেড়ে চলে যাবেন। পাশেই এক এডভোকেটের বাড়ি ছিল, রইসউদ্দিন নাম। সুধাময় সেই রইসউদ্দিনের কাছে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকার বাড়িটিকে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে চলে এলেন। সুরঞ্জন অবশ্য এর বিরুদ্ধে ছিল। সে বাড়ি ছেড়ে যাবে না, দরকার হলে সে পাড়ার মাস্তানদের বিরুদ্ধে কেইস করবে। রাতে রাতে ঢিল পড়তে লাগল বাড়িতে। উড়ো চিঠি আসে মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবে তারা। সুধাময় থানায়ও গিয়েছিলেন। থানার পুলিশ বলল, কী বলব মশায়, আপনি কেইস করুন— তবে মনে হয় না আমরা কিছু করতে পারব। সুরঞ্জন ওদের নাম জানত, বাবু, লিটন, সাদেক, ভুলন, টমাস। সতের আঠারো বছর বয়স ওদের, ওরা বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিস দেয়, গেট খুলে বাড়িতে ঢুকে গাছের নারকেল, আম, পেয়ারা, বড়ই পেড়ে নিয়ে চলে যায়। বাগানের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। অত্যাচার দিন দিন এমন বাড়ল যে সুধাময় রইস উদ্দিনের কাছে গেলেন একদিন, বললেন, এ বাড়িতে আমি আর থাকছি না। বদলির চেষ্টা করছি, ঢাকায় বদলি হচ্ছি। বাড়িটি বিক্রিই করে দেব। তাছাড়া এখানে প্র্যাকটিসও আজকাল ভাল জমছে না। স্বদেশী বাজারের সেই পুরোনো ফার্মেসীতে বসে থাকি বিকেলবেলা, কিন্তু রোগী নেই। দু'চারটে দরিদ্র রোগী আসে, তাও হিন্দু। এত দরিদ্র যে ওদের কাছ থেকে টাকা নিতে ইচ্ছে করে না।

সুধাময় রিটায়ার করেছেন। সুরঞ্জনকে বলছেন চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর সুরো, আমি আর ক'দিন বল। হার্টের অসুখ, বাঁচব মনে হয় না বেশিদিন। কিরণময়ী সুরঞ্জনকে বুঝিয়ে বলে— যদি এই দেশে আর টিকে থাকা সম্ভব না হয় মায়াকে নিয়ে তোমরা কলকাতা চলে যাও। আমি আর তোমার বাবা বাকি কটা দিন এখানেই থাকি।

কলকাতা যাবার কথা শুনলে সুরঞ্জনের মাথায় রক্ত উঠে যায়। কেন যাবে সে কলকাতায়? কলকাতায় সুরঞ্জনের কাকা, মামা মাসি সকলে আছেন, কিন্তু সুরঞ্জনের কখনও মনে হয় না কলকাতা তার দেশ। তবে সুরঞ্জন নিজের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার সেই জোরটাও আজকাল আর পায় না। বিশেষ করে নব্বই এর পর তার মনে হয়েছে সে যেন এই দেশের কেউ নয় এই দেশ যেন তার নয়, সে এখানে পরবাসী। অনেকে তাকে এও বলেছে, তোরা তবে বাবরি মসজিদে হাত দিলি কেন? 'তোরা'— সুরঞ্জন অবাক হয়েছে 'তোরা কে? ভারতের হিন্দু আর সুরঞ্জন কি এক হল? তবে কি সুরঞ্জনের দেশ আসলে ভারত? এই দেশে সে জন্ম থেকে পরবাসী?

নব্বই-এ কী ঘটেছিল সুরঞ্জন ভাবতে চেষ্টা করে। তার হাতের চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিরণময়ী সুধাময়ের শিয়রের কাছে বসে আছে। সুধাময় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন সুরঞ্জন কিছু আদেশ করে কি না, বলে কি না চল তৈরি হও। ঘরে তালা দাও। লুট হয় হোক, প্রাণে তো বাঁচি। সুধাময়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। দেশভাগের পর থেকে প্রাণে বাঁচবার জন্য লড়াই করে আসছেন তিনি, এখনও তাঁকে লড়াই করতে হচ্ছে। দূর থেকে একটি মিছিলের শব্দ ভেসে আসে। কিরণময়ী হঠাৎ উঠে জানালা বন্ধ করে দেয়। জানালা বন্ধ করলেও মিছিলটি যখন ধীরে ধীরে বাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়

তখন স্পষ্ট শোনা যায় তারা শ্লোগান দিচ্ছে 'একটা দুইটা হিন্দু ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর।' সুধাময়ও শোনেন মিছিলের ভাষা, তিনি কেঁপে ওঠেন। সুরঞ্জনের হাতের কাপটি নড়ে ওঠে সামান্য।

নব্বই এর অক্টোবরেও এই শ্লোগান দিয়েছিল ওরা। কী ভীষণ কাণ্ড ঘটেছিল তখন, ঢাকেশ্বরী মন্দির আগুনে পুড়িয়ে দিল ওরা, আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে রইল পাশে, কোনও বাধা দিল না, পুড়ে গেল মূল মন্দির, বিধ্বস্ত করে ফেলল মন্দিরের ভেতরে দেবীর আসন, ধ্বংস করে ফেলল নাটমন্দির, শিবমন্দির, অতিথিশালা, অতিথিশালার পাশে শ্রীদাম ঘোষের বাস্তুভিটে। ধ্বংস করে ফেলল গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির, নাটমন্দির, গৌড়ীয় মঠের অতিথিশালা, মন্দিরের ভেতরের জিনিসপত্র লুটপাট করে, মাধব গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির ধ্বংস করল। জয়কালী মন্দির চূর্ণ হয়ে গেল, ব্রাহ্ম সমাজের বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতরের ঘরটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল। রামসীতা মন্দিরের ভেতরে কারুকাজ করা ঠাকুরের সিংহাসনটি বিধ্বস্ত করে ফেলল, বিধ্বস্ত করল মূল ঘর, নয়াবাজারের মঠ ভেঙে ফেলা হল, বনগ্রাম মন্দির শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলল প্রায়, শাঁখারি বাজারের মুখে সাতটি হিন্দুর দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের পর পুড়িয়ে দেওয়া হল। শিলা বিতান, সুর্মা ট্রেডার্স, সেলুন ও টায়ারের দোকান, লণ্ড্রী, মিতা মার্বেল, সাহা কেবিনেট, রেষ্টুরেন্ট কিছুই রক্ষা পেল না। শাঁখারি বাজারের মোড়ে এমন ধ্বংসযজ্ঞ ঘটল যে যতদূর চোখ যায় ধ্বংসের চিহ্ন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। ডেমরা শনির আঁখড়ার মন্দির লুট হল, পঁচিশটি পরিবারের বাড়ি ঘর লুট করল দু'তিনশ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী। লক্ষ্মীবাজারে বীর ভদ্রের মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ভেতরের সব নষ্ট করে দিল, ইসলামপুর রোডের ছাতা আর সোনার দোকানগুলো লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিল। নবাবপুর রোডের মরণচাঁদের মিষ্টির দোকান ভেঙে ফেলল, ভেঙে ফেললো পুরানা পল্টনের মরণচাঁদও। রায়ের বাজারের কালি মন্দিরটি ভেঙে মূর্তি ফেলে দিল মাটিতে। সূত্রাপুরে হিন্দুদের দোকান লুট করে ভেঙে মুসলমানের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হল। নবাবপুর রোডের ঘোষ এন্ড সন্স এর মিষ্টির দোকানটি লুটপাটের পর নবাবপুর যুব ইউনিয়ন ক্লাব এর একটি ব্যানার দোকানের ওপর টানিয়ে দেওয়া। ঠাটারি বাজারের বটতলির মন্দির ভেঙে তছনছ করা হল। নবাবপুরে রামধন পশারি নামের প্রাচীন দোকানটি লুট করা হল, বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির মাত্র কয়েক গজের মধ্যে শুকলাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ভেঙে চুরমার করা হল, প্রখ্যাত বাদ্যযন্ত্রের দোকান যতীন এন্ড কোং এর দোকান এবং কারখানা এমনভাবে ভেঙে ফেলল যে ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে শুরু করে সবই অগ্নিদগ্ধ হল, ঐতিহাসিক সাপ মন্দিরের অনেকটা গুঁড়ো করে ফেলল, সদরঘাট মোড়ে রতন সরকারের মার্কেট লুটপাট করল, ভাঙচুর করল। সুরঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নব্বই-এর লুটপাটের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো। নব্বই-এর ঘটনাকে কি দাঙ্গা বলা যায়? দাঙ্গা অর্থ মারামারি-এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের নাম দাঙ্গা। কিন্তু এটিকে তো দাঙ্গা বলা যায় না, এটি হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের ওপর আরেক সম্প্রদায়ের হামলা। অত্যাচার। নির্যাতন। সুরঞ্জনের হাতে চায়ের কাপ। চা ঠাণ্ডা হতে থাকে, সুরঞ্জন চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যায়। সে দাঁত দাঁত চেপে সংযত করে ক্রোধ।

www.BDeBooks.Com

২

সুরঞ্জনের বন্ধুদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য ওরা ধর্মটর্ম তেমন মানে না, আর মানলেও সুরঞ্জনকে কাছের মানুষ ভাবতে ওরা কোনও দ্বিধা করেনি কখনও। কামাল তা গতবার নিজে এসে নিয়ে গেল বাড়িসুদ্ধ। শুধু তাই নয় পুলক, কাজল, অসীম, জয়দেবও তো সুরঞ্জনের বন্ধু— কিন্তু প্রিয় এবং কাছের বন্ধুদের মধ্যে কামাল, হায়দার, রবিউল, বেলালের মত নয়। সুরঞ্জনের যে কোনও বিপদে এরাই সাহায্য করেছে বেশি। সুধাময়কে একবার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে ভর্তি করবার প্রয়োজন হয়েছিল। খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে বেলাল ছুটে এল, বেলাল নিজে দৌড়োদৌড়ি করে হাসপাতালে ভর্তি করাল বারবার বলল, কাকাবাবু আপনি একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না, আমাকে আপনি নিজের ছেলেই মনে করবেন। সুরঞ্জনের মন ভরে গেছে দেখে। রবিউল বা কামালকেও যতটুকু আপন করে সুরঞ্জন পেয়েছে, অসীম বা কাজলকে ততটা পায়নি। শুধু তাই নয় পারভিনকে সুরঞ্জন যতটুকু ভালবেসেছিল সুরঞ্জনের মনে হয় না কোনও অর্চনা, ললিতা, দীপ্তি বা সুনন্দাকে সে ততটুকু ভালবাসতে পারবে।

ছোটবেলার একটি কথা সুরঞ্জনের মনে পড়ে।সে তখন ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে পড়ে। ক্লাস থ্রি ফোর হবে বোধহয়। খালেদ নামের এক ক্লাসমেটের সঙ্গে তার ক্লাসের পড়া নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্ক হচ্ছিল। তর্ক একসময় তুঙ্গে উঠলে খালেদ তাকে গাল দেয়, গালের মধ্যে কুকুরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে হিন্দু শব্দটিও ছিল। সুরঞ্জনও একই রকম গাল খালেদকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সে ভেবেছিল কুকুরের বাচ্চার মত হিন্দুও এক ধরনের গাল। তাই খালেদকে গালের বদলে গাল দিল— তুই হিন্দু। সুরঞ্জন অনেককাল ভেবেছিল হিন্দু বোধহয় তুচ্ছার্থে, ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত কোনও শব্দ। পরে আরও বড় হয়ে সুরঞ্জন বুঝেছে হিন্দু একটি সম্প্রদায়ের নাম এবং সে এই সম্প্রদায়ের মানুষ।

সুধাময় নাস্তিক মানুষ। তিনি কখনও বাড়িতে পূজোআর্চার ব্যবস্থা করেন না। অথচ তার সন্তানদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে হয় সমাজে। নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবার স্পর্ধা এখনও এই সমাজ অর্জন করেনি। সুরঞ্জন দেখেছে মায়ার মধ্যেও অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া। ইস্কুলের পাঠ্য বিষয়গুলোয় ধর্ম একটি বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল। ইসলামিয়াত ক্লাসে তাকে ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া হত, সে একা একটি হিন্দু মেয়ে ক্লাসের বাইরে বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ, বড় বিচ্ছিন্ন মনে হত নিজেকে তার। বাড়িতে একদিন সে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, আমাকে ক্লাস থেকে বার করে দেয় টিচার।

কেন?

সবাই ক্লাস করে। আমাকে নেয় না, আমি হিন্দু তাই।

সুধাময় শুনে, সেই কত আগে মায়াকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন। অপমানে, কষ্টে তিনি সেদিনই টিচারের বাড়ি গিয়ে বলে এলেন আমার মেয়েকে ক্লাসের বাইরে

পাঠাবেন না। ওকে কখনও বুঝতে দেবেন না ও আলাদা কেউ। মায়ার মানসিক সমস্যা ঘুচল কিন্তু আলিফ বে তে সের মোহে ওকে পেয়ে বসল। কিরণময়ী বলত এসব করছে কী ও, নিজের জাতধর্ম বিলিয়ে এখন ইস্কুলে লেখাপড়া করতে হবে নাকি? সুধাময়ের অবশ্য মেয়ের আরবি শেখাতে আপত্তি ছিল। কিন্তু একদিকে মেয়ের মানসিক অবস্থা সুস্থ রাখা জরুরি, অন্যদিকে মেয়ে আবার ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করে ফেলে কিনা এই আশংকাও হয়। সুধাময় ওই ঘটনার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ইস্কুলের হেডমাষ্টারের কাছে একটি দরখাস্ত লিখেছিলেন যে, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, এটি স্কুলের পাঠ্য হওয়া জরুরি নয়। তা ছাড়া আমি যদি আমার সন্তানকে কোনও ধর্মে শিক্ষিত করবার প্রয়োজন না মনে করি তবে তাকে তো স্কুল কর্তৃপক্ষ কখনও জোর করে ধর্ম শেখাবার দায়িত্ব নিতে পারে না। আর ধর্ম নামক বিষয়টির পরিবর্তে মনীষীদের বাণী, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী ইত্যাদি সম্পর্কে সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য একটি বিষয় রচনা করা যায়। তাতে সংখ্যালঘুদের হীনমন্য বিচ্ছিন্ন ভাবটিও দূর হয়। সুধাময়ের এই আবেদনে ইস্কুল কর্তৃপক্ষ সাড়া দেননি। যেভাবে চলছিল, সেভাবেই চলছে।

সুরঞ্জন ছোটবেলা থেকে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, আনন্দমোহন কলেজে সে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে যুগ্ম সম্পাদক পদে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, জিতেও গিয়েছিল সেবার। কী উত্তপ্ত সময় গেছে তখন। কলেজে তার জনপ্রিয়তা যেমন ছিল, প্রভাবও ছিল তেমন। অথচ সুধাময় বাধ সাধলেন এ শহর থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। কোথায়? সুধাময়ের ওই এক কথা তুমি মায়াকে নিয়ে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাও। আমি নিরঞ্জনদার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। নিরঞ্জন সুধাময়ের পিসতুতো দাদা। কিন্তু সুরঞ্জন যাবে না। শেষ পর্যন্ত মিমাংসা এরকম হল যে ঠিক আছে দেশ না ছাড়ো শহর ছাড়তে হবে। শহর ছেড়ে তারপর ঢাকায় আসা। ঢাকায় দুরুম তিনরুমের বাড়ি ভাড়া করে কোনও মতে বেঁচে থাকা। অঢেল সেই বিত্ত নেই, সেই বিলাসিতার জীবন নেই, সব হারিয়ে সুধাময় মাথা গুঁজলেন অল্প পরিসরের ভাড়া ঘরে– যে মানুষ একসময় অনড় থেকেছেন, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছেন সেই মানুষই সবচেয়ে বেশি টলমলে হলেন, সবচেয়ে বেশি পলায়নপর। সুরঞ্জন বোঝে সব, বুঝেই এবার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাবে না। মুসলমানরা যদি বাড়িঘর জ্বালিয়ে, তাদের সবাইকে কেটে রেখে চলে যায় তবুও সুরঞ্জন নড়বে না।

আট তারিখে সারা দেশে হরতাল ছিল। হরতাল আসলে ডেকেছিল ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। মাঝখান থেকে জামায়াতে ইসলামি জানায় তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে হরতাল ডাকছে। সেই রাতে তাই প্রচার হল যে জামাতে ইসলামি দলটি সারাদেশে শান্তিপূর্ণ হরতাল ঘটিয়েছে। সেদিন বিকেলে সুরঞ্জন বেরিয়েছিল হাঁটতে। কিরণময়ী বাধা দিয়েছিল বাইরে যাসনে সুরঞ্জন। সুরঞ্জন তবুও প্যান্টশার্ট পরল, বলল, যা হয় হবে। এত ভয় পেও না তো। তোমাদের ভয় দেখলে আমার রাগ ধরে।

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জন এই কথাটি বলে। বলে কিন্তু বুঝতে পারে ওরা তো আর শখ করে ভয় পায় না। চারদিক থেকে যা খবর আসছে তাতে ভয় না পাবার কোনও কারণ নেই। সুরঞ্জনেরও কি একটু ভয় ভয় লাগে না, নিশ্চয় লাগে। তবু সে বেরোয়। বেরোতে গেলেই সুরঞ্জন অবাক হয় যে পাড়ার একদল ছেলে, বয়স বারো থেকে পনেরোর মধ্যে, চেঁচিয়ে ওঠে হিন্দু ধর হিন্দু ধর বলে। অথচ এরাই কাজে অকাজে সুরঞ্জনদা এটা করে দিন ওটা করুন বলে বাড়িতে ভিড় করেছে। পাড়ায় ফাংশান করব সুরঞ্জনদা গান গাইবেন, মঞ্চটা ঠিক হল কি না দেখে যাবেন, চাঁদা দিন, একটু দেখিয়ে দিন, একটু বলে দিন। আর এদের আত্মীয়স্বজনদের পাড়ার লোক বলে খাতির করে ফ্রি চিকিৎসা করে আসছেন সুধাময়, সে অনেক বছর হল। সুরঞ্জন ওদের দিকে তাকিয়ে উল্টো পথে হাঁটে। সুরঞ্জন নিজে কোনওদিন ধর্ম মানে না। বাবা শেখায়নি। কিরণময়ী বিয়ের পর পর ঘরে লক্ষ্মীর পট, দুচারটে দুর্গা কালির ছবি টবি নিয়ে একটু আড়াল হত। দেখে সুধাময় বলতেন আমার বাড়িতে ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি। ব্যাস চলল না। তবে একটা জিনিস বাড়ির সকলে করে, সে হল পুজোর দিন বেশ দল বেঁধে পুজো দেখতে বেরোয়। ময়মনসিংহে দুর্গাপূজা বেশ আড়ম্বর করা হত।সুরঞ্জন ছোটবেলা থেকে বারোয়ারি পূজা উৎসবে মণ্ডপের পেছনে খাটাখাটনি করত। সারাদিন গান হচ্ছে, সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করছে, গান শুনছে, প্রসাদ খাচ্ছে, এর ওর বাড়ি গিয়ে নাড়ু খাচ্ছে, লক্ষ্মীপূজোয় সারারাত জেগে বাড়ি বাড়ি নারকেল চুরির খেলা খেলছে, অষ্টমীর দিন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে নামছে। এসব কখনও ধর্মের অনুভব থেকে সুরঞ্জন করেনি, করেছে উৎসবের আনন্দ থেকে দল বেঁধে। সুরঞ্জন গান শিখেছিল, গলা ছেড়ে আসরে গান গাইত সে, চুয়াত্তরের দূর্ভিক্ষে দলের ব্যানার নিয়ে দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকে চাল ডাল নিয়ে এসেছিল। বন্যা হলেও দলের কাজ বেড়ে যায়, স্যালাইন বানাও, বিলি কর। এসব কাজে সুরঞ্জন সবার আগে দাঁড়িয়ে যায়।

সুরঞ্জন যখন মতিঝিল পার হচ্ছে, হাতের বাঁদিকে হঠাৎ দেখে পোড়া ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিস। আরও সামনে সিপিবি অফিসও পোড়া। সিপিবি অফিসের সামনে ফুটপাতে ভাল ভাল বই নিয়ে বসত দু একজন বিক্রেতা, পুড়ে ছাই করে দিয়েছে সব বই। গতকাল দুপুরে জামাত শিবির যুব-কমান্ডের সন্ত্রাসীরা এই অপকাণ্ডগুলো করেছে। এলাকায় চরম উত্তেজনা, লোকজনের জটলা, কি হয়েছে কি হবে এসব নিয়ে ফিসফিস উত্তেজক কথাবার্তা। সুরঞ্জনের সঙ্গে সিপিবি অফিসের সামনে কায়সারের দেখা হয়। কায়সার কমিউনিস্ট পার্টি করে। সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ছোটাছুটি করছিল। সুরঞ্জনকে দেখে থামে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, তুমি বেরিয়েছ কেন?

সুরঞ্জন হেসে বলে, আমার কি বেরোতে মানা?

– মানা নেই, তবে জানোয়ারগুলোকে তো বিশ্বাস নেই সুরঞ্জন। এরা তো আসলে কোনও ধর্ম মানে না। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো তক্কে তক্কে আছে কোনও একটা ইস্যু তাদের ফেভারে নিয়ে চিৎকার করতে। যেন তাদের উঁচু গলাটা সবাই শোনে। সুরঞ্জন হাঁটতে থাকে, পাশে কায়সারও। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, আর কোথায় কোথায় আগুন ধরাল ওরা?

কায়সার তোপখানার দিকে হাঁটে। সুরঞ্জনও। কায়সার বলতে একটু সময় নেয়, কিন্তু বলে—চট্টগ্রামের তুলসীধাম, পঞ্চাননধাম, কৈবল্যধাম মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া মালিপাড়া, শ্মশান মন্দির, কোরবানীগঞ্জ, কালিবাড়ি, চট্টেশ্বরি, বিষ্ণুমন্দির, হাজারি লেন, ফকির পাড়া এলাকার মন্দিরের সব লুটপাট করে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। কায়সার কাঁধ শ্রাগ করে বলে, অবশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিছিলও বেরিয়েছে।

সুরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কায়সার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, কাল শুধু মন্দির নয়, মাঝিরঘাট জেলেপাড়ায় আগুন জ্বেলে দেয়, অন্তত পঞ্চাশটি ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তারপর কি হল? সুরঞ্জন নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

তারপর, তারপর আর কী। নন্দনকানন তুলসীধামের এক সেবক দীপক ঘোষ পালিয়ে যাবার সময় জামাতিরা তাকে ধরে জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পাশে কয়েকজন দারোয়ান ছিল, ওরা দীপককে মুসলমান এবং তাদের আত্মীয় পরিচয় দিলে জামাতিরা দীপককে মারধোর করে ছেড়ে দেয়।

সুরঞ্জন হাঁটতে হাঁটতে প্রেসক্লাবের সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেকে যারা পরিচিত, তাকে দেখে চমকে ওঠে। কী ব্যাপারে আপনি বা তুমি এখানে কেন? বিপদ হতে পারে। ঘরে চলে যাওয়া উচিত। সুরঞ্জনের বড় অপ্রতিভ লাগে। তার নাম সুরঞ্জন দত্ত বলে তাকে ঘরে গিয়ে লুকোতে হবে আর কায়সার, লুৎফর, হেলাল, শাহীনদের ঘরের বাইরে বের হলে কোনও অসুবিধে হবে না। অথচ ওরা একই রকম প্রগতিশীল, একই বিশ্বাসে ওরা মনে ও মননে বেড়েছে। সুরঞ্জন বেশ উদাস দাঁড়িয়ে থাকে, সিগারেটের দোকানে একটি বাংলা ফাইভ চায়, পয়সা দিয়ে আগুনমুখো দড়ি থেকে সিগারেট ধরায়। সিগারেটে টান দিয়েও তার ভঙ্গি পরিবর্তিত হয় না।

গুঞ্জন বাড়ছে। জটলা বাড়ছে সাংবাদিকদের। সকলের মুখে এক প্রসঙ্গ। বাবরি মসজিদ। ভারতে এ পর্যন্ত দুশর ওপর লোক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে। আহত কয়েক হাজার। আর এস এস শিবসেনাসহ মৌলবাদি দলগুলো নিষিদ্ধ। লোকসভায় বিরোধী নেতার পদ থেকে আদভানির পদত্যাগ। সুরঞ্জন এসব আলোচনা থেকে নিজেকে বড় বিচ্ছিন্ন বোধ করছে কি? বোধহয় করছেই। তা না হলে তার বারবার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে কেন? সুরঞ্জন লক্ষ্য করে, তাকে সকলেই আড়াল করছে, করুণা করছে, তাকে দলে নিচ্ছে না, তারা মিছিল করবে, আন্দোলন করবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, অথচ সেই দলে সুরঞ্জনের তো থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু সুরঞ্জন নিজেও যেন অনেকটা মিশে যেতে পারছে না কায়সার বা লুৎফরদের দলে, তবে কি একথা সত্য যে ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙা এবং সেই সূত্র ধরেই এদেশের মন্দির ভাঙা— এই ঘটনার সঙ্গে লুৎফর এবং সুরঞ্জনের মধ্যে অদৃশ্য একটি দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। লুৎফর তার চেয়ে কম মেধাবি ছেলে। তাকে একদিন একটি পত্রিকা অফিসে নিয়ে গিয়ে পরিচিত সম্পাদককে বলে কয়ে সুরঞ্জন চাকরি নিয়ে দিয়েছিল। সেই লুৎফর সুরঞ্জনের বাড়ি প্রায়ই বসে থাকত। সুরঞ্জন আজ লক্ষ্য করছে, লুৎফর যেন তাকে করুণা করছে। লুৎফর এগিয়ে এসে চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, বলে, সুরঞ্জনদা, বাড়িতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জন হেসে বলে, কি অসুবিধে?

লুৎফর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, কি আর বলব সুরঞ্জনদা।

লুৎফর অন্য সময় সুরঞ্জনের সঙ্গে নিচুকণ্ঠে কথা বলত। এবার গলাটা তার উঁচু। সে একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলে, দাদা আপনি বরং আজ অন্য কোথাও থাকুন, বাড়িতে থাকাটা ঠিক হবে না। এরপর খানিক ভেবে কপাল কুঁচকে বলে, আচ্ছা সুরঞ্জনদা আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনও মুসলমানের বাড়িতে অন্তত দুটো রাত থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?

সুরঞ্জনের কণ্ঠে নির্লিপ্ত। সে লুৎফরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল—না।

না? লুৎফর এবার আরও একটু চিন্তিত হল।

সুরঞ্জন খুব মনোযোগ দিয়ে সিগারেটে টান দিল।

লুৎফর ভাবছে। তার ভাববার ভঙ্গিতে এক ধরনের অভিভাবকত্ব আছে। সুরঞ্জনের মনে হয়, এখন যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে গেলেই যে কেউ এরকম অভিভাবকত্ব দেখাবে, এবং না চাইতে আগ বাড়িয়ে উপদেশ দেবে। সুরঞ্জন তাই সহজ হতে পারে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় সে একা বসে থাকবে কোথাও। এক বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, কোনও নির্জন জায়গায়। কোথায় এমন জায়গা এই ঢাকা শহরে?

লুৎফরের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে সুরঞ্জন বেরিয়ে এল রাস্তায়, হাঁটতে লাগল সেগুন বাগিচার দিকে, সেগুনবাগিচা এজিবি অফিসের পাশ দিয়ে কাকরাইলে উঠল, হাঁটতে হাঁটতে সে ডানে লক্ষ্য করল 'জলখাবার' নামের একটি দোকান ভাঙা, ভেতরের আসবাবপত্র বাইরে রাস্তায়, আগুন ধরানো। 'জলখাবার' পুড়িয়েছে কারণ এটা হিন্দুর দোকান। সুরঞ্জন শুনেছে মরণচাঁদও ভেঙে নাকি চুরমার করেছে। সব মিষ্টির দোকান ভাঙা হচ্ছে। কারণ কি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব? নাকি মিষ্টি খাওয়া, লুটপাট? সুরঞ্জনের মনে হয় ধর্মের চেয়ে হাতের থাবাটিই এখানে বড়। নব্বই-এ লুট হয়েছিল ঘরবাড়ি সোনার দোকান। ধার্মিকেরা কি কখনও পারে বিধর্মীর সম্পদ লুট করে নিজের ধর্ম রক্ষা করতে? এ তো আসলে ধার্মিকের কাজ নয়, এ হচ্ছে গুণ্ডা বদমাশদের কাজ। গুণ্ডা বদমাশরা সুযোগ পেলেই থাবা দেয়, আর সবলেরা দুর্বলের ওপর আঘাত তো করবেই।

শহর সাংঘাতিক থমথমে। বায়তুল মোকাররম এলাকায় উত্তেজনা, জামাত-শিবির যুবকমান্ড সন্ত্রাস করছে দেশ জুড়ে। পুলিশ গুলি ছুঁড়লে একজন মারাও যায় ঢাকায়। দেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আচমকা বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গটি এল; সুযোগ নিল দেশের স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি। সুরঞ্জন চামেলিবাগে পুলকের বাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলকের বাড়িতে সে গত দেড় বছর যায়নি। পুলক নিজে দরজা খোলে, সুরঞ্জনকে ভেতরে ঢুকিয়ে সে বলে, সারাদিন ঘরে বসে আছি। নীলা তো ভয়ে কাঁপছে।

সুরঞ্জন সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে। সে ভাবছে পাশে রফিকের বাড়ি না গিয়ে সে আজ পুলকের বাড়ি এল কেন, রফিকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বেশি। সে কি ভেতরে ভেতরে

কম্যুনাল হয়ে উঠছে, নাকি পরিস্থিতি তাকে কম্যুনাল করছে। পুলকের ছেলে অলক কাঁদছে। পুলক বলল, ও কাঁদছে কেন জান? এতকাল সে পাশের ফ্ল্যাটের সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেছে। কাল থেকে রবিন, মিশুক, পলাশ ওকে খেলায় নিচ্ছে না। বলছে তোমাকে খেলায় নেব না, হুজুর বলেছে হিন্দুদের সঙ্গে না মিশতে।

হুজুর মানে? সুরঞ্জন প্রশ্ন করল।

হুজুর হচ্ছে সকালে মৌলভী আসে আরবি পড়াতে, সেই লোক।

পাশের ফ্ল্যাটে আনিস আহমেদ থাকে না? সে কমিউনিষ্ট পার্টি করে সে তার বাচ্চাদের হুজুর দিয়ে আরবি পড়ায়?

হ্যাঁ। পুলক বলে।

নীলা এল। নীলাকে, পুলককে, পুলকের ছেলে অলককে তার বড় আপন মনে হচ্ছে। বড় কাছের মানুষ। নীলা পাশের সোফায় বসে অনুযোগ করল সুরঞ্জনদা, কতদিন আসেন না, খবর নেন না বেঁচে আছি কি মরে গেছি জানতেও আসেন না। খবর পাই পাশের বাড়িতেই আসেন। বলতে বলতে নীলা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। নীলা কাঁদছে কেন, সম্ভবত ও খুব অসহায় বোধ করছে। বেলালের বাড়িতে চার পাঁচদিন আগেও আড্ডা দিয়েছে সুরঞ্জন, এ বাড়িতে আসেনি। সুরঞ্জন নীলার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন? ঢাকায় বেশি কিছু করতে পারবে না ওরা। পুলিশ পাহারা আছে শাঁখারিবাজারে, ইসলামপুরে, তাঁতিবাজারে।

পুলিশ তো গতবারও দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ঢাকেশ্বরি মন্দির লুট করল, আগুন ধরাল পুলিশের সামনে, পুলিশ কিছু করল? জলখাবার পুড়িয়ে দিয়েছে দেখেছেন।

হ্যাঁ।

আপনি রাস্তায় বেরোলেন কেন? কোনও বিশ্বাস নেই মুসলমানদের। ভাবছেন বন্ধু, দেখবেন সে-ই আপনাকে গলা কেটে ফেলে রাখল।

পুলকের বাড়িতে ফোন আছে। সুরঞ্জন হিন্দু বন্ধুবান্ধব, চেনা অল্পচেনা অনেককে ফোন করে, দিলীপ দেকে জিজ্ঞেস করে আছেন কেমন, কোনও অসুবিধে নেই তো? দিলীপ দে বললেন, অসুবিধে নেই কিন্তু মনে স্বস্তি পাচ্ছি না।

পুলক বলে, দেবব্রতর খবর নাও তো। দেবব্রতর ওই এক অবস্থা, এখনও হয়নি কিছু, কিন্তু হতে কতক্ষণ। স্বস্তি পাচ্ছি না।

মহাদেব ভট্টাচার্য, অসিত বর্ধন, নির্মল সেনগুপ্ত, সজল ধর, মাধবী ঘোষ, কুন্তলা চৌধুরী, সরল দে, নিখিল সান্যাল, রবীন্দ্র গুপ্ত সকলের খবর নিতে সুরঞ্জনের ভাল লাগে— এতদিন পর পরিচিত অনেকের সঙ্গে কথা হয়, এক ধরনের আত্মীয়তাও অনুভূত হয়।

নীলা চা আনে। চা খেতে খেতে মায়ার কথা ওঠে। মায়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয় সুরঞ্জনের। সে যদি হুট করে একদিন জাহাঙ্গীরকে বিয়েই করে বসে, তখন উপায় কী হবে? সুরঞ্জন ভাবে মায়াকে পারুলের বাড়ি থেকে যাবার পথে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। ওখানে থেকে ওই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগে ওর বেশ সুবিধে। দুঃসময়ে মানুষ যে কোনও সিদ্ধান্ত ঝট করে নিয়ে ফেলে।

www.BDeBooks.Com

পুলকের এর মধ্যে ফোন আসে। ফোনে কথা সেরে পুলক জানায় কক্সবাজারে জামাত শিবিরের লোকেরা জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। সুরঞ্জন শুধু শোনে এবং নিজের নির্লিপ্তি দেখে নিজে সে অবাক হয়। সে অন্য কখনও এই খবর শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ত। আজ মনে হচ্ছে এই পতাকা পুড়ে গেলে তার কিছু যায় আসে না। এই পতাকা তার নয়। সুরঞ্জনের এমন হচ্ছে কেন? সে আজ হরতালের সন্ত্রাসের শহরে একা একা হেঁটে বেড়িয়েছে, বেড়িয়েছে সুরঞ্জন দত্ত নাম নিয়ে, কোনও মহীউদ্দিন বা আবদুল মালেক নামে নয়। সে পার হয়ে এসেছে, তার শরীরের কোথাও আঁচড় লাগেনি। কিন্তু আঁচড় বা আঘাত বা মৃত্যু কি এসে উপস্থিত হচ্ছে না দেশের আর সব সুরঞ্জনদের ওপর? সুরঞ্জন কেন তার দায় নেবে না? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সদস্য কাজল দেবনাথ তার চেনা। একবার ভাবে কাজলকে বলে সুরঞ্জন নাম লেখাবে ওই দলে। অবশ্য কখনও সে ওই দল করবার পক্ষপাতি ছিল না। কারণ দলে মুক্ত চিন্তার সুস্থ চিন্তার অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সঙ্গে না নেবার কারণ দেখে না সুরঞ্জন।

পুলক তার ঘনিষ্ঠ বসে, বলে, আজ আর যেও না। এখানেই থেকে যাও। এ সময় আমাদের কারুর রাস্তায় বেরোনটা ঠিক নয়।

পুলকের এই বাক্য লুৎফরের বাক্যের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু সুরঞ্জন অনুভব করে পুলকের কণ্ঠে আন্তরিকতা আছে, আর লুৎফরের কণ্ঠে কোথায় যেন সূক্ষ্ম অহংকার বা ঔদ্ধত্য আছে। অথবা নেই, কিন্তু সংখ্যালঘুর যন্ত্রণা সংখ্যালঘু ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে অনুভব করতে পারে না বলেই লুৎফরের পরামর্শ সুরঞ্জনের গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

নীলা বলে, দেশে আর থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আজ হয়ত কিছু হচ্ছে না, কাল হবে, পরশু হবে। অনিশ্চিত জীবনের চেয়ে নিশ্চিত দরিদ্র জীবন অনেক ভাল।

সুরঞ্জন নীলার এই সিদ্ধান্তে আপত্তি করে না। পুলকও করে না।

পুলকের প্রস্তাবে সুরঞ্জন রাজি হত। কিন্তু সুধাময় কিরণময়ী দুজনে তার জন্য দুশ্চিন্তা করবে বলেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। রাত আটটা অবধি পুলকদের সঙ্গে কাটিয়ে সুরঞ্জন একটি রিক্সা নেয়। পুলক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। এখন ব্যবসা করে। বিয়ে থা করে ছোট্ট সংসার নিয়ে বেঁচে আছে। সুরঞ্জনেরই কেবল সংসার হল না। বয়স অনেক হয়ে গেছে। এই বয়সে কি আর বিয়ে হয়। রত্না নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে একমাস হল। মেয়েটি একটি এনজিওতে কাজ করে। রত্না একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল এখন করছেন কি?

কিছু না।

চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য, কিছু না?

না।

রাজনীতি করতেন, সেটা?

ছেড়েছি।

যুব ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন জানতাম।

ওসব আর ভাল্লাগেনা।

বিয়ে করেননি কেন?

কেউ পছন্দ করেনি বলে।

কেউ না?

একজন করত। সে রিস্ক নেয়নি আলটিমেটলি।

কেন?

সে মুসলমান ছিল, আর আমাকে তো বলা হয় হিন্দু। হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে, ওকে তো আর হিন্দু হতে হত না। আমাকেই আবদুস সবুর নাম রাখতে হত। রত্না হেসেছিল শুনে, বলেছিল বিয়ে না করাই ভাল, কদিনের মাত্র জীবন, বন্ধনহীন কাটিয়ে যাওয়াই তো ভাল।

তাই বুঝি আপনিও ওপথ মাড়াচ্ছেন না।

ঠিক তাই

রত্নার সঙ্গে সংলাপগুলো সুরঞ্জন আবার পাড়ে। মনে মনে। টিকাটুলির দিকে রিক্সাকে না গিয়ে পলাশি ঘুরে যেতে বলে। পলাশিতে থাকেন নির্মলেন্দু গুণ, কবি। তাঁর কী অবস্থা একবার দেখে যাওয়া উচিত। রত্নাই বা কেমন আছে, কে জানে। আজিমপুর থাকে, যাবে একবার? গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আপনি ভাল আছেন রত্না মিত্র? সুরঞ্জন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের কারণে এক ধরনের হিন্দু পুনর্মিলনী হচ্ছে, তা অনুমান করে সুরঞ্জন। রত্নার বাড়িতে এসময় উপস্থিত হলে রত্না নিশ্চয় অবাক হবে না, ভাববে এ সময় সবারই উচিত সবার দুঃসময়ে সঙ্গী হওয়া।

পলাশীতে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কর্মচারীদের জন্য কলোনী আছে। ওর একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। দরজায় টোকা দিলে দশ বারো বছরের একটি মেয়ে দরজা খুলে দেয়।

নির্মলেন্দু গুণ বিছানায় বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। সুরঞ্জনকে দেখেই বললেন, এস এস, আছ কেমন?

এখন অবধি বেঁচে আছি। সুরঞ্জন বলে। আপনি যে না দেখেই দরজা খুলে দিলেন? যদি জামাতিরা মারতে আসত।

গুণ হেসে বললেন— আসবে, কথা বলব, আমার সঙ্গে কথোপকথনে গেলেই কনভিনসড হবে। বরং তাদেরই তখন আমি ধমক দিয়ে বিদায় করতে পারব। কাল রাত দুটোর সময় কিছু ছেলে রাস্তায় জমা হয়ে মিছিল করবার প্লান করছিল, হাঁক দিলাম, ওখানে চিৎকার করছে কারা? ব্যস চলে গেল দূরে। আর আমার চুল দাড়ি দেখে তো অনেকে ভাবে আমি মুসলমান মৌলভী।

গুণ হাঁক দিলেন, গীতা চা দে।

www.BDeBooks.Com

দু কাপ চা এল। চা খেতে খেতে গুণ বললেন, আমি তো বিছানা থেকে নামি না।

কেন?

ভয়ে। মনে হয় বিছানা থেকে নামলেই ওরা বোধহয় ধরে ফেলবে।

দিনরাত দরজা বন্ধ করে বসে আছেন তাহলে?

বিছানায় বসে থাকি। দরজা খোলা থাকে দিনে। আর রাতে কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিই, জিজ্ঞেস করি না কে।

কেন?

বোঝানোর জন্য যে আমি ভয় পাচ্ছি না।

সুরঞ্জন হেসে উঠল। এই কবির মধ্যে অসম্ভব আমুদে একজন মানুষ বাস করে।

গুণ বললেন, তুমি যে অন্যের খোঁজ খবর নিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার নিজের নিরাপত্তা আছে তো? সুরঞ্জন ভাবল, তার নিরাপত্তা আদৌ আছে কি না। টিকাটুলির বাড়িতে বাবা মা বসে আছেন দুশ্চিন্তায়, ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় তাঁদের নীল হয়ে আছে মুখ, সুরঞ্জন জানে না এর মধ্যে বাড়ির জিনিসপত্র লুট করে বাড়িটিতে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কি না। দিতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। সুরঞ্জনের মনে হয় এই দেশের জন্য এখন কিছুই আর অসম্ভব নয়।

নির্মলেন্দু গুণ আছেন বেশ। আমেরিকার লস লাসভেগাসের ক্যাসিনোয় বসে জুয়ো খেলতে পারেন, আবার পলাশীর বস্তিতে বসে মশার কামড়ও খেতে পারেন। কিছুতেই আপত্তি নেই, বিরক্তি নেই তার। গুণদাই ভাল লোক, যে কোনও পরিবেশে তিনি চমৎকার হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন। এতে অমল আনন্দে তিনি ভেসে থাকেন কী করে সুরঞ্জন ভাবে। আসলেই কী আনন্দ, নাকি বুকের ভেতর তিনিও গোপনে গোপনে খুব দুঃখ পোষেন, কিছুই করবার নেই বলে হেসে পার করেন দুঃসহ সময়।

পারুলের বাড়ি, রত্নার বাড়ি কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না সুরঞ্জনের। সে উদাসিন হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে ঢুকে অদ্ভুত এক ব্যাপার লক্ষ্য করে সুরঞ্জন, কিরণময়ী ঘরের কোণে ধোয়া জলচৌকিতে একটি ঠাকুর বসিয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে গলায় আঁচল জড়িয়ে মেঝেয় মাথা ঠুকছে, সুরঞ্জন ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এসব কী হচ্ছে মা?

কিরণময়ী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ভগবান, ভগবান বলে। কিরণময়ী ভগবানকে ডাকছে। সুরঞ্জন এমন দৃশ্য কখনও তাদের বাড়িতে দেখেনি। এসব কপাল ঠোকাঠুকি দেখলে সুরঞ্জনের গা ঘিন ঘিন করে।

সুরঞ্জন কিরণময়ীর দু'বাহু ধরে দাঁড় করায়, বলে হয়েছে কি তোমার, বল? কাঁদছ কেন? আর এইসব মূর্তি নিয়ে বসেছ কেন, মূর্তি তোমাকে বাঁচাবে?

কিরণময়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোর বাবার ডান হাত পা অবশ হয়ে গেছে, কথা জড়িয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের দিকে চোখ ফেরায় সুরঞ্জন, শুয়ে আছেন, অস্থির শরীর, কথা বলছেন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কি বলছেন।

সুরঞ্জন সুধাময়ের কাছ ঘেঁষে বসে ডান হাতটি ধরে বুঝতে পারে সুধাময়ের হাতে কোনও চেতন নেই, শক্তি নেই। বুকের ঝোপে কুড়োলের একটি কোপ পড়ে সুরঞ্জনের। যা হবার, তা হয়েই গেছে। এখন ডাক্তার ডাকলেই বা কী, ডাক্তার বলবেন এখন শুধু শুয়ে থাকতে হবে আর ফিজিওথেরাপি দিতে হবে। সুরঞ্জনের দাদুর স্ট্রোক হয়েছিল, ঠিক একই রকম, সুরঞ্জন পাশে ছিল, সে জানে ঠিক এই এই হয়। ব্লাড প্রেসার দেখে প্রেসার কমানোর ওষুধ খেতে দেয় ডাক্তার নিয়মিত। কিন্তু অবশ হাত পা দ্রুত ভাল করে দেবার কোনও ওষুধ নেই।

সুরঞ্জন বড় ছেলে, দায়িত্ব তার কাঁধেই বর্তাবে। এই সংসারকে সচ্ছল বলা যাবে না। সুরঞ্জনের কোনও চাকরি স্থায়ী হয়নি। এখনও সুধাময়ের পেনশনের টাকায়, জমানো টাকায়, বাড়িতে কিছু রোগী দেখবার টাকায় সংসার চলে। মায়া দুটো টিউশনি করে, তাতে মায়া নিজের হাতখরচ চালায়। কেবল সুরঞ্জনই অকর্মণ্য। অথচ এই সংসারের হাল তারই ধরবার কথা। এখন কী হবে, ঘরে বসে রোগী দেখেও যা উপার্জন হত সেটিও তো বন্ধ। মামা মাসিরাও নেই, এক এক করে সবাই দেশ ছেড়েছে। দূর সম্পর্কের যারা আছে, তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে কামাল বা ওরা কেউ এসেছিল?

কিরণময়ী বলে, না।

কেউ একবার খোঁজ নিতে আসেনি সুরঞ্জন কেমন আছে। অথচ শহরে হেঁটে ঘুরে সুরঞ্জন সবার খোঁজ নিয়ে এল। সকলে ভালই আছে, কেবল সুরঞ্জন ছাড়া। সুধাময় যে সম্পর্কে তার কেউ হয়, সুধাময়ের অসুস্থতার পরই সুরঞ্জন তা অনুভব করে। মানুষটি বড় ভাল ছিল। বড় মায়া হয় তাঁর জন্য সুরঞ্জনের। সুরঞ্জন এখন হরিপদ ডাক্তারকে ডাকতে যাবে, তাঁর বাড়ি রাস্তার শেষ মাথায়। তিনি কি আসবেন এ বাড়িতে? সুরঞ্জনের সন্দেহ হয় এই রাতে সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস— এ সময় কি হরিপদ কাকা বেরোবেন রোগী দেখতে, হোক না সুধাময় তার একসময়ের বন্ধু, এখন তো রোগীই।

মায়া ফেরেনি? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

কিরণময়ী জবাব দেয়, না।

কেন ফেরেনি মায়া? সুরঞ্জন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। কিরণময়ী অবাক হয়। সুরঞ্জন খুব চুপচাপ নম্র স্বভাবের ছেলে, মাথা গরম করে কথা বলে না, আজ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কেন? মায়া পারুলের বাড়ি গিয়েছে, এ এমন কোনও অন্যায় কাজ নয়, বরং এ অনেকটা নিশ্চিন্তের, কারণ এটা হিন্দু বাড়ি। যারা লুট করতে আসবে, মায়াকে দেখে তাকেও লুট করতে পারে। এ তাদের জন্য ভালভাত। মেয়েরা তো সম্পদের মত। লুটেরারা সোনাদানা নিয়ে যায়, আর নিয়ে যায় মেয়ে।

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জন দুটো ঘরের মধ্যে পায়চারি করে আর আস্ফালন করে— কেন যাবে মায়া? আমাদের ওপর সে ভরসা হারিয়ে ফেলেছে?

মুসলমানরা তাকে ক'দিন বাঁচাবে? মুসলমানদের এত বিশ্বাস কেন ওর?

কিরণময়ী অবাক চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। সুরঞ্জনের ভাষা আর আচরণ সবই অদ্ভুত লাগছে কিরণময়ীর কাছে। বাবা তার অসুস্থ, প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আর সে মায়া কেন মুসলমানের বাড়ি গেল, এ নিয়ে রাগারাগি করছে। কিরণময়ী বলে, আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে।

দাঁড়াও। আবার চেঁচিয়ে ওঠে সুরঞ্জন।

কিরণময়ী থামে। ভেবেছ কি? আমি বসে থাকব, আর তুমি ডাক্তার ডাকবে? ভাবছ টাকাকড়ি কিছু নেই, বেকার ছেলে—এর দ্বারা কী আর হবে?

না সুরঞ্জন না। তোর বাবা......

রাখ। বাবা! পাড়ার দুটো পিচ্চি ছেলে তোমাদের ভয় দেখাল আর সেই ভয়ে চল্লিশ লক্ষ টাকার বাড়ি চল্লিশ হাজারে বিক্রি করেছ, এখন ভিক্ষুকের মত বাঁচ, লজ্জা করে না?

কথাগুলো সুরঞ্জন চিৎকার করে বলে। সুধাময় বাঁ হাত তুলে শান্ত হতে বলে সুরঞ্জনকে।

বারান্দায় একটি চেয়ার ছিল,সুরঞ্জন সেটিকে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

আর মেয়ে গেছে মুসলমানকে বিয়ে করতে। ভেবেছে মুসলমানরা তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে, মেয়ে বড়লোক হতে চায়।

সুরঞ্জন! কিরণময়ীও সমান তালে চেঁচায়।

সুরঞ্জন বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। সে ডাক্তার ডাকবে, হরিপদ, না সামাদ? কাকে ডাকবে? ভাবতে ভাবতে সে হরিপদের বাড়িই যায়। হরিপদ নেই। দরজায় তালা। ডাঃ সামাদ বাড়িতে আছেন। তিনি দয়া করে এলেন, দেখলেন! ফিস দেয় সুরঞ্জন, ডাঃ সামাদ সে ফিস পকেটে পুরলেন। বাহ্ এইতো মেডিকেল এথিকস। ডাক্তারের অসুখে ডাক্তার নিচ্ছে ডাক্তারের কাছ থেকে টাকা। সুরঞ্জন ম্লান হাসে। ব্লাড প্রেসার এখন ঠিক আছে সুধাময়ের। স্ট্রোক হয়েছে, প্রেসার বেড়েছিল, তাই, এখন শান্ত থাকতে হবে। বিছানায় বেড প্যান ব্যবহার করতে হবে। শুয়ে থাকতে হবে, উঠতে চাইলে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। সুধাময় সব বুঝলেন, চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। তিনি এখন বিষয় নয় কোনও কিছুর। তিনি এখন এই সচল পৃথিবী থেকে কিছুটা অচল বৈকি, কিছু অপ্রয়োজনীয়ও।

এখন কোন প্রশ্নটি আগে আসে— এই বাড়িটি হিন্দুর না এই বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছে, কোনটি? হিন্দুর বাড়ি হলে যে কোনও সময় আক্রমণের ভয় আর অসুস্থ হলে ভয় যে কোনও সময় আরও বেশি অসুস্থতার। কোন ভয়টি আগে দূর করবে সুরঞ্জন?

আক্রমণের ভয় থেকে আপাতত সে উদ্ধার পাচ্ছে না; কারণ কামাল আসেনি এবার একবারও খোঁজ নিতে। কারও বাড়িতে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। আর সুধাময়ের চিকিৎসা করাতে এখন সুধাময়ের সম্বল যা আছে তাই উপুড় করে দেখতে হবে হয় কিনা। ফিজিওথেরাপির ডাক্তার এসে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করিয়ে যাবে, টাকা নেবে একশ। প্রতিদিন একশ টাকা কি সম্ভব হবে দেওয়া? সুরঞ্জনের ইচ্ছে হয় এটিকে সম্ভব করবার। তার একটি চাকরি হলে সম্ভবত মাথার ভেতর বনবন করে উড়ে বেড়াত না দুশ্চিন্তার বোলতা। সুরঞ্জন দিন দিন বড় একা হয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াত, সংসারবুদ্ধি তার হয়নি কখনও, ইচ্ছে করেই সে বৈষয়িক হওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে; কারণ সবসময় অনুভব করেছে ঈশ্বরের মত একটি উদার অস্তিত্বকে, সুধাময়কে। যেন যে কোনও দুর্ঘটনায়, দারিদ্রে সুধাময়ই তাকে রক্ষা করবে। তার মনে হয়নি মানুষ দিন দিন বৃদ্ধ হচ্ছে, বয়সের ভারে ন্যুজ হচ্ছে, জগতের সকল কিছু থেকে আস্থা হারাচ্ছে, তাকে একটু সঙ্গ দেওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল তার বন্ধু হওয়া। সুরঞ্জনের গ্লানিই হচ্ছে, নিজের প্রতি গ্লানি। মায়াটাই বা কী। এখনও সে খবর পেল না, সুধাময়ের স্ট্রোক হয়েছে, 'এখনও সে কি তার বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে? হেসে বেড়াচ্ছে, নাকি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ডেটিংএ গেছে? সুরঞ্জনের আশংকা মায়া বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড লোভে ফিরোজা বেগম জাতীয় কিছু একটা হয়ে যাবে। সেলফিস।

www.BDeBooks.Com

৩

হায়দার এসেছে সুরঞ্জনের বাড়িতে। কেমন আছে জানতে নয়, স্রেফ আড্ডা দিতে। হায়দার আওয়ামী লীগ করে। একসময় সুরঞ্জন তার সঙ্গে ছোটখাট বাণিজ্য করতে নেমেছিল, উন্নতির সম্ভাবনা নেই বলে শেষ অব্দি বাদ দিতে হয়েছে পরিকল্পনা বা প্রকল্পটি। হায়দার ফাঁক পেলেই রাজনীতির প্রসঙ্গ তোলে। সুরঞ্জন আজকাল রাজনীতি নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। এরশাদ কি করেছিল, খালেদা কি করছে এসবের বিশ্লেষণ করবার চেয়ে সুরঞ্জনের মনে হয় ভাল একটি বই পড়া তারা চেয়ে অনেক ভাল। তবু হায়দার বক বক করছেই, রাজনীতি তার প্রিয় এবং একমাত্র বিষয়, সে এ বিষয় ছাড়া আর কোনও বিষয়ে কথা বলতেই সম্ভবত জানে না। হায়দার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নিয়ে লম্বা একটি বক্তৃতা দেয়। আচ্ছা হায়দার, সুরঞ্জন তার ঘরে, বিছানায় আধ শোয়া হয়ে প্রশ্ন করে তোমাদের রাষ্ট্রের বা সংসদের কি অধিকার আছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার? হায়দার চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সুরঞ্জনের লাল মলাটের বইগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছিল। সে ঠা ঠা করে হেসে ওঠে, বলে, 'তোমাদের রাষ্ট্রের' মানে? রাষ্ট্র কি তোমারও নয়?

সুরঞ্জন ঠোঁট চেপে হাসে, বলে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব প্রশ্নগুলোর জবাব তোমার কাছে চাইছি।

হায়দার এবার সোজা হয়ে বসে বলে তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে— না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনও অধিকার নেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার। সুরঞ্জন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে— রাষ্ট্রের বা সংসদের কি অধিকার আছে কোনও ধর্মকে অন্য ধর্মের চেয়ে প্রাধান্য বা বিশেষ আনুকূল্য দেখাবার?

হায়দার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়— না।

সুরঞ্জন তৃতীয় প্রশ্ন করে সংসদের কি অধিকার আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিবর্তনের? হায়দার চোখ বুজে মনোযোগ দিয়ে কথা ক'টি শোনে, বলে—নিশ্চয়ই না।

সুরঞ্জন আবার প্রশ্ন করে, দেশের সার্বভৌমত্ব সকল মানুষের সমান অধিকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান সংশোধনের নামে সেই ভিত্তিমূলেই কি কুঠারাঘাত করা হচ্ছে না?

হায়দার এবার তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। সুরঞ্জন ঠাট্টা করছে না, সে সিরিয়াসলি কথা বলছে।

সুরঞ্জন তার ষষ্ঠ প্রশ্ন করে, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বা স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয় না কি?

হায়দার কপাল কুঁচকে বলে, হয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সব জানা সুরঞ্জনের হায়দারেরও। সুরঞ্জনও জানে হায়দার আর সে এসবের উত্তরের ব্যাপারে একমত। তবু প্রশ্ন করবার অর্থ কি এই যে, হায়দার ভাবে, সুরঞ্জন হায়দারকে একটি বিশেষ সময়ে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করছে হায়দার ভেতরে ভেতরে সামান্যও সাম্প্রদায়িক কি না, তাই অষ্টম সংশোধনীর প্রসঙ্গ ওঠায় সে এই প্রশ্নগুলো করে।

সুরঞ্জন তার সিগারেটের শেষ অংশটুকু এ্যাশট্রেতে চেপে বলে আমার শেষ প্রশ্ন বৃটিশ ভারতে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টির কারণে প্রবর্তিত দ্বিজাতিতত্ত্বের জটিল আবর্তে বাংলাদেশকে আবার জড়িয়ে ফেলার এ অপচেষ্টা কেন এবং কাদের স্বার্থে? হায়দার এবার কোনও উত্তর না দিয়ে একটি সিগারেট ধরায়, ধোঁয়া ছেড়ে বলে, জিন্নাহ নিজেও কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—'আজ থেকে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবনে স্ব স্ব ধর্ম পরিচয়ে পরিচিত থাকবে না। তারা সকলেই শুধু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক জাতি পাকিস্তানের নাগরিক পাকিস্তানি এবং তারা শুধু পাকিস্তানি হিসেবেই পরিচিত হবে।

সুরঞ্জন আধ শোওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বলে, পাকিস্তানই বোধহয় ভাল ছিল, কি বল?

হায়দার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আসলে পাকিস্তান ভাল ছিল না মোটেও, পাকিস্তানে তোমাদের আশা করবার কিছু ছিল না। বাংলাদেশে হবার পর তোমরা ভেবেছ এই দেশে তোমাদের সবরকম অধিকার থাকবে, এ হচ্ছে সেকুলার রাষ্ট্র, কিন্তু এই দেশ যখন তোমাদের স্বপ্ন পূরণে বাধা হল, তখন বুকে তোমাদের লাগল বেশি।

সুরঞ্জন খুব জোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে শেষ পর্যন্ত তুমিও বেশ 'তোমাদের আশা, তোমাদের স্বপ্নটপ্ন' বলে গেলে। এই 'তোমরা' কারা? হিন্দুরা তো? তুমি আমাকেও হিন্দুর দলে ফেলালে? এতকাল নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাস করে এই লাভ হল আমার?

ভারতে এদিকে মৃতের সংখ্যা চারশ' ছাড়িয়ে গেছে। পুলিশ আটজন মৌলবাদি নেতাকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে বিজেপির সভাপতির মুরলি মনোহর যোশী আর এলকে আদভানিও রয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে সারা ভারতে বনধ পালিত হয়। বোম্বে, রাচি, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রে দাঙ্গা হচ্ছে, মানুষ মরছে।

এদেশের সাম্প্রদায়িক দলটি মুখে বলছে 'বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য ভারত সরকার দায়ী। ভারত সরকারের এই দোষের জন্য বাংলাদেশের হিন্দুরা দায়ী নয়। বাংলাদেশের হিন্দু ও মন্দিরের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও ক্ষোভ নেই। ইসলামিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে।' সাম্প্রদায়িক দলটির এই বক্তব্য টেলিভিশনে ও

www.BDeBooks.Com

সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। কিন্তু মুখে ওই কথা বললেও বাংলাদেশের মৌলবাদি দল যারা দেশে হরতালের দিন প্রতিবাদ জানানোর নামে যে তাণ্ডব চালিয়েছে, যে সন্ত্রাস, তা না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদের ছুতোয় একাত্তরের ঘাতকেরা নির্মূল কমিটির অফিস ও কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হামলা এবং ভাঙচুর করছে, আগুন লাগাচ্ছে। কেন? জামাতে ইসলামির একটি প্রতিনিধিদল বিজেপির নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছে। কী কথা হয়েছে তাদের, কী আলোচনা, কী ষড়যন্ত্র সুরঞ্জন তা অনুমান করে। পুরো উপমহাদেশে ধর্মের নামে যে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর যে নৃশংস নির্যাতন, সুরঞ্জন নিজে সংখ্যালঘু হয়ে টের পায় এই নৃশংসতা কত ভয়াবহ। বসনিয়া হারজেগোভিনার ঘটনার জন্য যেমন বাংলাদেশের কোনও খ্রিষ্টান নাগরিক দায়ি নয় তেমনি ভারতের কোনও দুর্ঘটনার জন্য বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক দায়ি নয়। এ কথা সুরঞ্জন কাকে বোঝাবে।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে আজ মানববন্ধন। হায়দার বলে, চল চল তৈরি হও, মানববন্ধনে যাব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে জাতীয় ঐক্য ও একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আঞ্চলিক সৌহার্দ্য ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে বিশ্বমানবতার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে সারাদেশে মানববন্ধন।

তাতে আমার কী? সুরঞ্জন প্রশ্ন করে।

তোমার কী মানে? তোমার কিছুই না? হায়দার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

সুরঞ্জন শান্ত, স্থির। বলে, না।

হায়দার এত বিস্মিত হয় যে সে দাঁড়িয়ে ছিল, বসে পড়ে। হায়দার আবার একটি সিগারেট ধরায়। বলে, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?

সুরঞ্জন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বলে, ঘরে চিনি নেই।

বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে জাতীয় সংসদ ভবন পর্যন্ত মানববন্ধনের রুট। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। হায়দার মানববন্ধন সম্পর্কে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুরঞ্জন থামিয়ে দিয়ে বলে কাল আওয়ামী লীগের মিটিং এ হাসিনা কি বলল?

শান্তি সমাবেশে?

হ্যাঁ।

বলল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবার জন্য প্রত্যেক মহল্লায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শান্তি ব্রিগেড গড়ে তুলতে হবে।

এতে কি হিন্দুরা অর্থাৎ আমরা রক্ষা পাব? মানে প্রাণে বাঁচব? হায়দার উত্তর না দিয়ে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। সুরঞ্জন দুদিন শেভ করেনি। চুল উস্কোখুস্কো। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টায় হায়দার। বলে, মায়া কোথায়? ও জাহান্নামে গেছে।

সুরঞ্জনের মুখে জাহান্নাম শব্দটি হায়দারকে চমকিত করে। বলে, জাহান্নামটা কিরকম শুনি?

ব্যাখ্যা জানা নেই। এই প্রজন্মের মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি আমার দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়।

বাড়িতে আর কেউ নেই, মেসো মাসিমা কোথায়? অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছ?

বাবার স্ট্রোক হয়েছে।

কি বললে? হায়দার তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। সুরঞ্জন বলে, অস্থির হয়ো না, বাবা একুশ বছর বাড়তি বেঁচে ছিলেন। তাঁর তো একাত্তরেই মরে যাবার কথা। সেখানে না মরে রীতিমত একুশ বছর পর স্ট্রোক হওয়ায় এ বেশ বেঁচে যাওয়া নয়?

একাত্তরে কি হয়েছিল?

এ... ...রের বাবা সেনা ছাউনি থেকে ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে ভাবা যায়?

নিশ্চয় মেরেছে খুব।

বেয়নেটে খুঁচিয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে ছ' ঘন্টা পিটিয়েছে। খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল বাবার। ওরা একটি কৌটায় পেচ্ছাব করে বাবার মুখ হা করিয়ে মুখের মধ্যে ঢেলেছে।

হায়দার মুখ নিচু করে থাকে। জিজ্ঞেস করে, আর?

সুরঞ্জন চুপ হয়ে থাকে। হায়দার আবার প্রশ্ন করে, আর কি করেছে?

ধার একটা দা' দিয়ে পেনিস কেটে দিয়েছে। বলেছে তোর মুসলমানি করে দিলাম, মা। পেনিসের সেই রক্তপাত আর ভাঙা পা নিয়ে ডাঃ সুধাময় দত্ত পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

তুমি তো কখনও বলনি।

এসব আর বলবার কী! আর আমাকেই এই সেদিন মাত্র বলরেন মা।

হায়দার চুপ হয়ে যায় হঠাৎ। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতার আর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। এক সময় হায়দারই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে—

ডাক্তার দেখিয়েছ?

তা দেখিয়েছি।

তুমি যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছ সুরঞ্জন। হায়দার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

আমি মানববন্ধনের জন্য লাফিয়ে উঠলে, মিছিলের আগে শ্লোগান দিয়ে গলা ভাঙলেই তো আমাকে মানায় বেশি, তাই না? বাবার স্ট্রোক হয়েছে এ নিয়েও আমি মাথা ঘামাচ্ছি না—এও নিশ্চয় তোমাকে অবাক করে।

হায়দার সুরঞ্জনের অনেকদিনের বন্ধু। একই বোধ, একই বিশ্বাসের মানুষ তারা। হায়দারের বোনের নাম পারভিন। পারভিনের ওপর যখন পরিবারের বাধা এসেছিল সুরঞ্জনকে ত্যাগ করবার, হায়দার কোন পক্ষে ছিল তা সুরঞ্জনের এখনও জানাই হয়নি। সুরঞ্জন শুনেছে পারভিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে হায়দার সবসময় নীরব থেকেছে।

www.BDeBooks.Com

নীরব থাকাটা সুরঞ্জনের তখন একদম পছন্দ ছিল না। যে কোনও একপক্ষ নেওয়া তো উচিত। হায়দারের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডাও হত তখন। পারভিন প্রসঙ্গে কোনও কথা হত না দুজনের মধ্যে। হায়দারই প্রসঙ্গ তুলত না, সুরঞ্জনও না।

আজ অনেকক্ষণ নীরব থেকে হায়দার বলে, পারভিন বোধহয় ডিভোর্স দেবে তার হাজবেন্ডকে। সুরঞ্জন এই জগৎ থেকে বড় বিচ্ছিন্ন চায়, তবু তার বুকের মধ্যে ধ্বক করে কিছু নড়ে ওঠে। পারভিন নামটি কি খুব যত্ন করে বুকের সিন্দুকে রাখা, নেপথলিন দিয়ে? বোধহয়। আজ পাঁচ বছর সে পারভিনকে দেখে না। সুরঞ্জনের বুকের ভেতর কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠতে চায় কিন্তু সে তা হতে দেয় না, রত্নার মুখটি সে ইচ্ছে করেই মনে করে। রত্না মিত্র। মেয়েটি চমৎকার। সুরঞ্জনের সঙ্গে মানাবেও ভাল। ফর্সা মুখ—কপালে সিঁদুরের টিপ, শাদা সিঁথিতে সিঁদুর—প্রতিমার মত লাগবে নিশ্চয়। সুরঞ্জন ধর্ম মানে না তা ঠিক, কিন্তু এই আচার অনুষ্ঠানগুলো, এগুলো সে খুব পালন করতে চায়। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, শাঁখা সিঁদুর এসব কুসংস্কারের প্রতীক হয়ত, কিন্তু এসব পালনে যে বাঙালিত্ব তা এতদিনে সব সংস্কার ছাপিয়ে উঠেছে। পারভিনকে তো আর শাঁখা সিঁদুর পরানো যেত না। কিরণময়ী সব বাদ দিয়েছে, দিয়েছে কি শুধু আদর্শের জন্য, দিয়েছে লতিফা শরিফার ক্যামোফ্লেজে বেঁচে থাকবার জন্য—সুরঞ্জনের তাই মনে হয়। সুরঞ্জনকে ঘরের বার করা হায়দারের পক্ষে সম্ভব হয় না। হায়দার শেষ অবধি চলে যায়। বাড়ি তার কাছেই, প্রতিবেশি বলা যায়। গণআদালত যেদিন হল, সুরঞ্জনই হায়দারকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেছে, গণসমাবেশের দিন বেশ ঝড়বৃষ্টি ছিল, হায়দার বলেছিল আজ বোধহয় যাওয়া যাবে না। সুরঞ্জন বলেছিল, যাওয়া যাবে না মানে? তৈরি হও তাড়াতাড়ি। এই আমি বসে রইলাম, তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছি না। হায়দার অবাক হয়, আজ মানববন্ধনের দিন সকাল নটা থেকে এগারোটা অবধি সুরঞ্জনের বাড়িতে কাটিয়ে সুরঞ্জনকে না নিয়ে ফিরতে হবে, একথা সে ভাবতে পারেনি।

মায়াকে কিরণময়ী নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। এসেই মায়া বাবার ওপর পড়ে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিয়েছে। কান্না দেখলে সুরঞ্জনের বড় রাগ ধরে। চোখের জল ফেলে জগতে কিছু হয়? তার চেয়ে টাকা জোগাড় কর, তাই দিয়ে অসুস্থ মানুষটির জন্য ভাল কিছু খাবার, ফলমূল, ওষুধ কেন, ডাক্তার দেখাও নিয়মিত। ভাবতে ভাবতে সুরঞ্জনের মনে হয় তার কিছু কাজ করা দরকার। চাকরি করতে তার ইচ্ছে করে না; কারণ পরের গোলামি করা সুরঞ্জনের ধাতে সইবে না। হায়দারের সঙ্গে পুরোনো ব্যবসায় আবার জড়াবে কি না ভাবতে ভাবতে সুরঞ্জনের বড় ক্ষিদে পায়। দুপুর পার হয়ে যায়। তাকে কেউ খেতে ডাকে না। সুধাময়কে নিয়ে কিরণময়ী আর মায়া ব্যস্ত। সুরঞ্জনের ক্ষিদে পেয়েছে, তার এখন খাবার দরকার এই কথা সে কাকে জানাবে। কিরণময়ীকে? মায়াকে? বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে অথবা আদৌ রান্না হচ্ছে কি না সুরঞ্জন জানে না। এসবের খবর নিতে তার ইচ্ছে করে না। সে কাউকে না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কারও বাড়ি

গিয়ে কিছু খেতে হবে তাকে। বিকেল পার হয়ে যাচ্ছে। সুধাময়ের ঘরে সে আজ সারাদিন ঢোকেনি, কিরণময়ী বা মায়াও তার ঘরে আসেনি। অবশ্য দরজা ভেজানো ছিল, ঘরে দু'ঘন্টা হায়দার ছিল। সম্ভবত ওরা ভেবেছে সুরঞ্জন ঘরে আড্ডা দিচ্ছে, এখন যাওয়াটা ঠিক নয়। আর সুরঞ্জন এত আশাই বা করে কেন? কী করেছে সে সংসারের জন্য, কেবল বাইরে বাইরে ঘুরেছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে, বাড়ির সবার সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করেছে, যে কোনও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পার্টির যে কোনও নির্দেশ বংশবদ ভৃত্যের মত পালন করেছে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে মার্কস লেনিনের বই মুখস্থ করেছে। কী লাভ হয়েছে এতে সুরঞ্জনের? সুরঞ্জনের পরিবারের?

সুরঞ্জন একটি রিক্সা নিয়ে পুলকের বাড়িতে যায়। পুলককে ঘরেই পাওয়া যায়। সে আজ চারদিন ঘরবন্দি। বাইরের দরজায় শক্ত তালা দিয়ে ঘরে বসে থাকে। পুলককে প্রথম কথাই সুরঞ্জন বলে—কিছু খাবার দাও, বাড়িতে বোধহয় রান্নাটান্না হয়নি আজ।

নীলা ফ্রিজের ঠাণ্ডা ভাত-তরকারি গরম করে টেবিলে দেয়। পুলক জিজ্ঞেস করে, কেন রান্না হয়নি?

ডাঃ সুধাময় দত্তের স্ট্রোক হয়েছে। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা আপাতত তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত। এককালের ধনাঢ্য সুকুমার দত্তের পুত্র সুধাময় দত্ত এখন নিজের চিকিৎসার খরচ যোগাতে পারে না।

পুলক বলে, আসলে তোমার চাকরিবাকরি করা উচিত ছিল।

মুসলমানদের দেশে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন। আর এই মূর্খদের আন্ডারে কাজ করব কী বল?

পুলক বিস্মিত হয়, সে সুরঞ্জনের আরও কাছে সরে আসে। জিজ্ঞেস করে, বল কি সুরঞ্জন! তুমি মুসলমানদের গাল দিচ্ছ?

ভয় পাচ্ছ কেন, গাল তো তোমার সামনে দিচ্ছি, ওদের সামনে তো আর দিচ্ছি না। সামনে ওদের কি গাল দেওয়া সম্ভব? ধড়ে কি তবে মুণ্ডুটি থাকবে?

সুরঞ্জন অক্ষম আক্রোশে সোফার হাতলটি চেপে ধরে। ভাত দেওয়া হয়, সুরঞ্জন খেতে বসে, খেতে খেতে বলে, আমাকে কিছু টাকা ধার দাও পুলক, যেভাবেই হোক।

তা না হয় দেওয়া যাবে। দেশের খবর জান তো? মানিক গঞ্জের, চট্টগ্রামের ভোলার টুঙ্গিপাড়ার, শেরপুরের?

এই তো বলবে যে সব মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেছে। হিন্দুদের ঘর বাড়ি লুট করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে, পুরুষদের মেরেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে— এ ছাড়া আর কোনও নতুন খবর থাকলে বল।

এগুলো তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে?

নিশ্চয় স্বাভাবিক, কী আশা কর তুমি এই দেশ থেকে? পিঠ পেতে রেখে বসে থাকবে, আর তারা কিল দিলে গোস্বা করবে, এ তো ঠিক নয়।

পুলক চুপ হয়ে যায়। বলে, তোমার টাকা লাগবে কত?

www.BDeBooks.Com

পাঁচ হাজার। পুলক পাঁচ হাজার টাকা দিতে সামান্য দেরি করে না।

সুরঞ্জন খাওয়া শেষ করে জিজ্ঞেস করে, অলককে এখনও খেলতে নেয়নি?

না। সে সারাদিন মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে।

শোন পুলক, আসলে যাদের ভাবি অসাম্প্রদায়িক, যাদের বন্ধু ভাবি, নিজেদের মানুষ ভাবি, যাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছি যে আমরা এখন অনর্গল আসসলামু আলায়কুম বলি, খোদা হাফেজ বলি, জলকে পানি বলি, স্নানকে গোসল বলি, যাদের রমজান মাসে আমরা বাইরে চা সিগারেট খাই না, এমনকি প্রয়োজনে কোনও হোটেল রেস্তোরাঁয় খেতে পারি না দিনের বেলা, তারা আসলে আমাদের কতটুকু আপন? কাদের জন্য আমাদের এই স্যাক্রিফাইস, বল? পুজোয় কদিন ছুটি পাই, আর দুটো ঈদের মরসুমে তো সরকারি অফিস হাসপাতালগুলোতে ঘাড় ধরে হিন্দুদের দিয়ে কাজ করানো হয়। অষ্টম সংশোধনী হয়ে গেল, আওয়ামী লীগ কদিন চেঁচাল ব্যাস, হাসিনা নিজেই তো এখন মাথা ঢেকেছে ঘোমটায়। হজ্জ করে আসবার পর চুল দেখা যায় না। এমন ঘোমটাই দিয়েছিল। সবার চরিত্র এক পুলক, সবার। এখন আমাদের সবার হয় আত্মহত্যা করতে হবে, নয় দেশ ছাড়তে হবে।

সুরঞ্জন টাকা কটি পকেটে নিয়ে চলে যায়। সোজা বাড়ি গিয়ে সে কিরণময়ীর হাতে দেবে টাকা। কিরণময়ী কি করে যে হাল ধরে আছে সংসারের, এই খোঁজ সুরঞ্জন আগে নেয়নি। সুধাময় অসুস্থ হবার পর প্রথম যখন পুত্রের ওপর দায়িত্ব পড়ল, তখনই সে সচেতন হল। অবশ্য দায়িত্ব তাকে কেউ দেয়নি, নিজেই সে অনুভব করেছে। সকলে হয়ত ভেবেছে দেশপ্রেমিক ছেলে, দেশের মঙ্গলচিন্তায় সে দিনরাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে পার করছে, নিজের সুখসুবিধের জন্য বিয়ে পর্যন্ত করেনি, বাবা মা বোনের দিকে নজর দেবার সময় হয় না তার, তাই তাকে আর দায়িত্ব দিয়ে বিরক্ত করবার প্রয়োজন কী। মায়াই বরং টিউশনি বাড়িয়ে দিক। কিরণময়ী নিজে সুধাময়ের বাকি যা টাকা পয়সা আছে, অথবা ধার কর্জ করে হলেও কারও সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ব্যবসায় খাটাবে, যা আসবে ও থেকে, তাই দিয়ে চলবে। কিরণময়ী একবার বলেছিল ময়মনসিংহে রইসউদ্দিন সাহেবের কাছে একবার যাওয়া যায় কি না, এত অল্প টাকায় বাড়িটি নিয়ে নিয়েছেন, এই দুঃসময়ে তিনি যদি কিছু সাহায্য করেন।

সুরঞ্জন কারও কাছে যাবে না। পুলকের কাছে সহজে সে চাইতে পেরেছে, কারণ পুলককে একসময় সে দিয়েছে খুব। আর এবার সে কোনও মুসলমানের কাছে হাত পাতবে না। বাড়ি ফিরবার আগে সুরঞ্জন মনস্থির করে সে রত্নার বাড়ি একবার যাবে, আজিমপুরে। রত্না বাড়িতেই ছিল, অবশ্য বলল সে তিনদিন বাড়িতে ছিল না, পাশেই এক মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সুরঞ্জনকে সে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সুরঞ্জন ভাবে কোনও ভনিতা না করে সে রত্নাকে বলবে— চলুন আমরা বিয়ে করি।

রত্নার সঙ্গে তার অল্পদিনের পরিচয়। এতে অল্পদিনে হঠাৎ বিয়ের কথা তোলা শোভন নয়। তা ছাড়া রত্না জানে সে বেকার একটি ছেলে, এই ছেলেকে বিয়ে করে রত্নারই বা কী লাভ। সুরঞ্জনের মনে হয় এরা যে কোনও দিন যে কোনও করিম রহিমকে বিয়ে করে আফরোজা, খালেদা ইত্যাদি নাম ধারণ করবে, আর দিনে পাঁচবার মেঝেয় কপাল ঠুকবে, মানে নামাজ পড়বে।

রত্নার বাড়িতে এক কাপ চা পর্যন্ত বসেছে সুরঞ্জন। চা শেষ করেই বলেছে, উঠি।

এত শিগগিরি, তবে এলেন কেন?

দেখতে এলাম অক্ষত আছেন কি না। দরজা খুলে চলে যেতে যেতে সুরঞ্জন বলে।

অক্ষতর তো দুটো অর্থ, কোনটি দেখতে এসেছিলেন?

সুরঞ্জন সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেবে বলে, দুটোই।

সুরঞ্জনের আর বলা হয়নি শেষ পর্যন্ত, চলুন আমরা বিয়ে করি। সুরঞ্জন রত্নার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবে বিয়েরই বা কী দরকার জীবনে? বিয়ে হবে, সুরঞ্জনের ঘরে একটি খাট, একটি টেবিল, টেবিলে গাদাগাদি করে বইপত্র রাখা। ব্যস, ওর মধ্যে রত্নাকে ঢুকিয়ে, রত্নার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে, ভোরবেলা উঠে, চাকরিবাকরি করে টাকা পয়সা জমিয়ে ভাল খাওয়াদাওয়া, ভাল একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকা, সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে লেখাপড়া শেখানো—কি লাভ এতে? কী লাভ মানুষের বেঁচে থাকায়? এই যে সুধাময় বেঁচে আছেন ধুঁকে ধুঁকে, তাঁকে অন্যরা পেচ্ছাব পায়খানা করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে কী লাভ তাঁর এরকম বেঁচে থেকে? সুরঞ্জনই বা কেন বেঁচে আছে। একবার ভাবে টাকা তার প্যান্টের পকেটে, কয়েকটা পেথিডিন কিনে একবার পুশ করলে কেমন হয় শিরায়। মরে যাবে, নির্ঘাত মরে যাবে। আর মরে গেলে, ধরা যাক বিছানায় সে মরে পড়ে আছে, বাড়ির কেউ জানল না, ভাববে ঘুমিয়ে আছে ছেলে, তাকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। একসময় মায়া ডাকতে আসবে দাদা। তখন তার দাদা আর সাড়া দেবে না, গা ধরলেই চমকে উঠবে, কাঠ হয়ে পড়ে আছে দেখবে সুরঞ্জনের নিষ্প্রাণ শরীর।

সুরঞ্জন বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে অবাক হয় দরজা হাট করে খোলা। খোলা, এবং ঘরের জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে আছে। টেবিল উল্টে পড়ে আছে, বইপত্র মাটিতে, বিছানার তোশক চাদর মাটিতে গড়াচ্ছে। আলনার কাপড়চোপড় ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। সুরঞ্জনের শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, সে দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে দেখে ও ঘরে একই অবস্থা, কাঠের একটি আলমারি, ভাঙা, ঘরের সিলিং ফ্যানটি পর্যন্ত ভাঙা। সুধাময় মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। কিরণময়ী নেই, মায়াও নেই।

বাবা, কী হয়েছে বাড়িতে?

www.BDeBooks.Com

ছেলেছোকরারা এসে এসব করে গেছে, আমাকে একটু দাঁড় করিয়ে দে বাবা, মায়াকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, কিরণময়ী পেছন পেছন গেছে। সুরঞ্জন মায়াকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

সুধাময়ের কথা জড়িয়ে যায়। সুধাময়কেও মেরেছে নিশ্চয়, উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, না পারছে হাত পা নাড়াতে না পারছে কাউকে চিৎকার করে ডাকতে। মায়াকে এখন কোথায় খুঁজবে সুরঞ্জন! রাত সাড়ে দশটা বাজে। দরজা খোলা, সুরঞ্জন হায়দারের বাড়ি যায়, গিয়ে সোজা বলে, আমাদের মায়াকে দাও।

মানে?

সুরঞ্জনের কথা বলতে কষ্ট হয়। গলার কাছে আটকে থাকে দলা পাকানো কষ্ট। বলে, মায়াকে দিয়ে দাও তোমরা, ব'লে হঠাৎ হায়দারকে জাপটে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুরঞ্জন। হায়দার কিছু বুঝতে পারে না কী হয়েছে সুরঞ্জনের, বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছে কেন? এইমাত্র সে বাড়ি ফিরছে, এখনও কাপড়চোপড় পাল্টানো হয়নি। আজ দলের মিটিং ছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে নেত্রী আহ্বান জানিয়েছেন সকল কর্মীকে।

মায়াকে নিয়ে গেছে, কারা নিয়ে গেছে সুরঞ্জন কিছুই জানে না। সুরঞ্জন কাঁদছে এই দৃশ্য হায়দারের চোখে নতুন। হায়দার শুনে অবাক হয়! সুরঞ্জন বলছে মায়াকে দিয়ে দাও তোমরা, এই তোমরাটা কারা? হায়দার আছে এই দলে? হায়দার বলে, "তোমরা' বলছ কাদের? আমি নিয়েছি মায়াকে? আমি নিয়েছি? বলে হায়দার সুরঞ্জনের কাঁধ ঝাঁকালো। সুরঞ্জন মুখ তুলতে পারে না, সে নত হয়, নত হতে হতে সে হায়াদারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলে— মায়াকে এনে দাও এক্ষুণি। হায়দার, তুমি পারবে। দয়া করে।

চল দেখি বলে হায়দার বেরিয়ে যায়, পেছন পেছন সুরঞ্জনও দৌড়োয়। টিকাটুলির যত মস্তান, পুরোনো ঢাকার মস্তানদের বাড়িঘর, আড্ডাখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, মায়ার খোঁজ পাওয়া যায় না। থানার লোকও নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে ডায়রি করবার খাতা টেনে নাম লেখে, ব্যাস। রাত চারটে পর্যন্ত খোঁজা হয়। নেই মায়া। রাত প্রায় শেষ হয় হয়, এমন সময় সুরঞ্জন ঘরে ফেরে। লণ্ডভণ্ড ঘরে বসে কিরণময়ী ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে, সুরঞ্জন মায়াকে নিয়ে ফিরবে এই আশায় সুধাময়ও তার চেতনাহীন অঙ্গ নিয়ে নিদ্রাহীন উদ্বিগ্ন সময় পার করছিল। না, সুরঞ্জন একা ফেরে, খালি হাতে। মায়া নেই। সুরঞ্জন ক্লান্ত, ব্যর্থ, নত—মায়াকে ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিরণময়ী সিঁটিয়ে আছে। বাড়ির দরজা জানালা সব বনধ, বাড়িতে ভেন্টিলেটর নেই, চোরের মত ঘুপচি ঘরে হাত পা মাথা গুটিয়ে বসে আছে ওরা। সুরঞ্জন কাছে এসে কিছু প্রশ্ন করবার আগে কিরণময়ী বলে, রফিক ছিল ওদের মধ্যে, এই পাড়ারই রফিক। মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায়ই দেখি। ওরা সাতজন ছিল মোট।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, কি করল ওরা এসে?

দরজায় খুব জোরে ধাক্কাল। বললাম কে? ওরা বলল মাসিমা খুলুন, কেমন আছেন দেখতে এসেছি। দরজা খুলে দেবার পরই দেখি ওরা হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। ওদের আর বয়স কত, উনিশ বিশ, বড়জোর একুশ বাইশ। ওদের চারজনের হাতে মোটা মোটা লাঠি ছিল, লাঠি দিয়ে ঘরের যা জিনিসপত্র ছিল সব ভেঙে ফেলছে, লাথি মেরে মেরে ফেলল— চেয়ার, টেবিল। টিভিটাও নিল।

আর?

মায়া আর আমি কুঁকড়ে গেছি ভয়ে। ওরা বলল গয়নাগাটি টাকা পয়সা কি আছে, বের কর।

তারপর?

তারপর ঘরে অল্পস্বল্প যা সোনার গয়না ছিল, মায়ার বিয়ের জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম, সেই আমার বিয়ের গয়না, সব নিয়েছে। নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন সময় একজন ঘুরে এসে মায়ার হাত ধরে দিল টান, তোর বাবার বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়, গোঙাতে লাগল, আমি মায়াকে টেনে রাখলাম সবটুকু শক্তি দিয়ে। আমি কি আর ওদের সঙ্গে পারি? শক্তিতে?

তারপর?

তারপর পেছন পেছন গেছি। নিচে দুটো স্কুটার দাঁড়ানো ছিল, মায়াকে টেনে ওরা স্কুটারে ওঠায়। স্কুটার দুটো সাঁ করে চলে যায় আমার চোখের সামনে। মায়ার কান্নার শব্দও আর শোনা যায় না। তারপর?

তারপর বাড়িওয়ালার বাড়িতে কেঁদে পড়লাম। লোকগুলো শুনল শুধু, চুক চুক করে দুঃখ করল। পাশের ফ্ল্যাটে গেলাম, ওপর তলায়, সবার ওই একই কথা, আহা। সবাই দুঃখ করল কিন্তু কেউ কোনও সাহায্য করল না।

তারপর ?

তারপর আর কী বাবা। ফিরে এসে দেখি তোর বাবা বলছে কিরণ ভেব না সুরঞ্জন গেছে মায়াকে আনতে।

দরজা জানলা শক্ত করে বন্ধ করে তিনটে প্রাণী ঘরে বসে আছে। তাদের মেয়ে অপহৃত। সম্ভবত এতক্ষণে তার ওপর গণধর্ষণও সারা। আচ্ছা এরকমও কি হতে পারে না, ছ বছরের মায়া যেমন দুদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছিল সেরকম যদি এবারও ও ফিরে আসে। সুরঞ্জন প্রাণপণে চায় মায়া ফিরে আসুক। ছোটবেলার মত উদাসীন পায়ে হেঁটে মায়া ফিরে আসুক। এই ছোট্ট, বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত সংসারে ও ফিরে আসুক।

হায়দার পৌঁছে দিয়ে গেছে সুরঞ্জনকে বাড়িতে। বলেছে সুরঞ্জন মন খারাপ করিস না, কাল দেখি কী করা যায়।

www.BDeBooks.Com

হায়দার আশা দিয়েছে। আশা যখন দিয়েছে, সুরঞ্জন কি এই স্বপ্ন দেখতে পারে যে হ্যাঁ মায়া ফিরবে। একুশ বছর বয়স মায়ার, প্রাণবান এক তরুণী। ওকে কেন ধরে নিয়ে যাবে ওরা, হিন্দু বলে? আর কত ধর্ষণ, কত রক্ত, কত ধনসম্পদের বিনিময়ে হিন্দুদের বেঁচে থাকতে হবে এই দেশে। কচ্ছপের মত মাথা গুটিয়ে রেখে? কতদিন? সুরঞ্জন জানতে চায় তার নিজের কাছেই, উত্তর নেই। হঠাৎ সুরঞ্জনের বমি পায়, প্রচণ্ড ঘুরে ওঠে মাথা, সে গলগল করে বমি করে বাথরুম ভাসিয়ে ফেলে। কিরণময়ী ফিসফিস করে কথা বলে, জোরে কথা বলতেও তার ভয় হয়। বাড়ির বাইরের যে কোনও শব্দেই সে চমকে ওঠে। কিরণময়ী সুধাময়ের দিকে ফিরে তাকায় না। সুরঞ্জনের দিকেও না। সে মেঝেয় বসে থাকে, দেওয়ালে পিঠ রেখে, ঘরের এক কোণে। মায়া বেঁচে থাকবার জন্য পারুলের বাড়ি লুকিয়ে ছিল কদিন, অথচ শেষ রক্ষা হয়নি, মায়া কি এখন ফেরত আসতে পারবে? এ সমাজে ধর্ষণ আর মরণ প্রায় একই, ধর্ষিতা মেয়েদের সুস্থ ও জীবিত মানুষ বলে গণ্য করবার রীতি নেই এখানে। এ বাড়িটি ওরা পুড়িয়ে দিতে পারত, যেহেতু এই বাড়ির মালিক হচ্ছে মুসলমান তাই পোড়ায়নি, নির্বিঘ্নে সম্পদ লুটেছে, মেয়েরা তো অনেকটা সম্পদের মত,তাই মায়াকেও লুট করেছে।

ছ' বছর আর একুশ বছর এক নয়। দুবয়সের মেয়েকে ধরে নেবার উদ্দেশ্যও এক নয়। সুরঞ্জন অনুমান করতে পারে একুশ বছর বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে সাতজন পুরুষ কী করতে পারে, মায়ার কি হাতপা বেঁধে নিয়েছে ওরা? মুখে কাপড় গুঁজে? সুরঞ্জনের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ওঠে ক্রোধে, যন্ত্রণায়। হায়দার খুঁজেছে ঠিকই, তবু সুরঞ্জনের মনে হয় হায়দার যেন ঠিক তেমন করে খোঁজেনি। মুসলমান দিয়েই মুসলমানদের খুঁজিয়েছে, কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তুলতে হয়, তেমন। সুরঞ্জনের হঠাৎ মনে হয়, হায়দার আসলে জানে মায়াকে কারা নিয়ে গেছে।

ছ বছর বয়স মায়াকে কেন নিয়েছিল ওরা, রেপ করতে? ব্ল্যাক মেইলিং? কিছুই তো করেনি শেষ পর্যন্ত। সুধাময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন মায়াকে, মায়ার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। হিসেবের সংসারে তরতর করে বেড়ে ওঠা মায়ার জন্য সুরঞ্জন কিছুই করেনি সম্ভবত। থাকে না দাদার কাছে নানারকম আবদার। বেড়াতে নাও, এটা খাব, ওটা পরব। সুরঞ্জন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সবচেয়ে বেশি। বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, পার্টি— কে মায়া, কে কিরণময়ী, কে সুধাময়, তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনে তার দরকার কী। সে এই দেশকে মানুষ বানাবে। সুরঞ্জন তোমার এই দেশ কি আর মানুষ হবে!

হায়দার হয়ত জানে রফিক কে। কোথায় থাকে। হয়ত দেখা যাবে রফিক তার আত্মীয়। হায়দারের কাছে রফিকের কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, যে করেই হোক এই পাড়ার রফিক ছেলেটিকে তার খোঁজ করতে হবে। হায়দারকে পরদিন ভোরবেলা আবার

ডেকে তোলে সুরঞ্জন। হায়দার বলে রফিক নামে এখানে কাউকে তো আমি চিনি না। তবু লোক লাগাচ্ছি। তুমি বাড়ি চলে যাও, আমার সঙ্গে থাকাটা তোমার ঠিক হবে না।

সুরঞ্জন চলে এল। হায়দারের সঙ্গে থাকা এখন ঠিক হবে না কেন সুরঞ্জন বোঝে। কারণ সুরঞ্জন হিন্দু, হিন্দু হয়ে মুসলমানদের শাস্তি দেওয়া বা ধমক দেওয়া ঠিক ভাল ঠেকে না, সেই মুসলমান চোর হোক কী খুনী হোক।

মায়া ফিরবে নিশ্চয়। যদি মেরে না ফেলে মায়াকে, সকল নির্যাতন শরীরে বহন করে আপন তিনজন মানুষের কাছে সে ফিরে আসবে নিশ্চয়। টিকাটুলির আর তিনটি হিন্দু বাড়ি লুট হয়েছে। সে রাতেই। সুরঞ্জন বাড়ি ফিরে বালিশে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। সুধাময় খানিক পর পর গোঙাতে থাকেন। সুরঞ্জনের ইচ্ছে করে কিছু বিষ কিনে এনে তিনজনই খেয়ে মরে যাক। কী দরকার বেঁচে থেকে। কী নিশ্চয়তা আছে এই দেশে?

কিরণময়ীও অদ্ভুত এক মানুষ। সর্বংসহা মাটির মত। চব্বিশ ঘন্টা আগলে রাখছে সুধাময়কে, এতটুকু ক্লান্তি নেই তার। সুরঞ্জনের কাছে সে কোনও আদেশ অনুরোধও করে না। যেন তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার সুধাময়ই ছিলেন, সুধাময় ছাড়া আর কারও কাছে তার কোনও প্রত্যাশা নেই। সুধাময় সুস্থ না হয়ে ওঠা অবধি সে নড়বে না। মায়া? মায়ার জন্য শেষ অবধি সকালের মায়াই হবে, আর কিছু করবার ক্ষমতা তো কারও নেই। কিরণময়ী গান জানত ভাল, সেই গানের গলা এখন আর নেই। বিয়ের পরও মফস্বলের ফাংশানে গান গাইত। লোকে বলত বেহায়া বেশরম মেয়ে, হিন্দু মেয়েদের আসলে কোনও লজ্জাশরম নেই। এইসব কটাক্ষ কিরণময়ীকে বড় অস্বস্তিতে ফেলত। নিজেকে সংযত করতে করতে কিরণময়ী পরে গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল। সুধাময়ের কাছে নিজে যেচে সে কিছু চেয়েছে বলে মনে পড়ে না। শাড়ি গয়নার প্রতি কিরণময়ীর আকর্ষণ ছিল না খুব একটা, সে কখনও এমন আবদার করেনি যে ওই শাড়িটি বা ওই গয়নাটি চাইই। সুধাময় প্রায়ই বলতেন কিরণময়ী তুমি কখনও কি মনের মধ্যে কোনও কষ্ট লুকিয়ে রাখ?

কিরণময়ী বলত—না তো!

সুধাময় কিরণময়ীকে আদর করে কাছে টেনে বলতেন, আমাকে জানিয়ো তোমার সব সুখদুঃখ, কেমন। কিরণময়ী হেসে বলত, আমার এই ছোট সংসারেই আমার স্বপ্ন, সুখ যা বল। নিজের জন্য আমি আলাদা কোনও আনন্দ চাই না।

সুধাময়ের বদলির চাকরি, আজ এ জেলায় কাল ও জেলায়। কিরণময়ী দুই সন্তানসহ থেকেই গেল ব্রাহ্মপল্লীর বাড়িতে। সন্তানদের দায়িত্ব তাকেই বেশি বহন করতে হয়েছে।

www.BDeBooks.Com

স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না। আর বিয়ের পর পাঁচ ছ বছর শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করতে হয়েছে। কিরণময়ীর বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নামকরা লোক। মেয়ে মেট্রিক পাশ করবার পর সুধাময়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাবা মা ভাইরা সব চলে গেলেন কলকাতায়। কিরণময়ীর দুজন মাসতুতো বোন, এক পিসি, পিসতুতো একটি ভাই কেবল দেশে রয়ে গেল। কিরণময়ীর ঠাকুরমা ঠাকুরদা, বাবা, মা, জ্যাঠা, কাকা, বড় পিসি, মাসি, মেসো, দুই মামা মামী এক এক করে চলে গেছেন। কিরণময়ীর বুকের মধ্যে তীব্র এক হাহাকার ছিল। বড় একা লাগত তার। অবশ্য সুধাময় তার সব একাকীত্ব দূর করে দিয়েছিলেন, সুধাময় বড় ভালবাসতেন এই একা হয়ে যাওয়া কিরণময়ীকে। তিনি চেম্বারে রোগী দেখে রাতে ঘরে ফিরে কিরণময়ীকে গল্প শোনাতেন, জান কিরণ আজ অদ্ভুত এক রোগী এসেছিল, বাচ্চা পেটে, এডভান্স স্টেজেও স্বামী তার পেটে এত জোরে লাথি লাগিয়েছিল যে মেয়েটির জরায়ু ফেটে গিয়েছিল। এই মৃত্যু থেকে বেঁচে এসেছিল মেয়েটি। আর তারপর সুস্থ হবার পর সে তার স্বামীকে সবার আগে দেখতে চাইল এমনকি উবু হয়ে স্বামীর পায়ের ধুলো পর্যন্ত নিল। কিরণময়ী খুব মন দিয়ে গল্প শুনত। সুস্থ থাকা তক মন ভাল থাকলে নিজের রোগীর চমকপ্রদ, দুঃখ বা আনন্দের যে কোনও ঘটনা সুধাময় কিরণময়ীকে বলতেন। সুধাময় চিরকাল উপার্জনের টাকা কটি মাসের প্রথম সপ্তাহের কিরণময়ীর হাতে তুলে দিতেন। কিরণময়ীর ওপর বড় একটি দায়িত্ব ছিল সংসার সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেবার। ঢাকায় আসবার পর কিরণময়ী প্রায়ই বলত আমি তো লেখাপড়া করা মেয়ে, ইচ্ছে করলে কোথাও চাকরি বাকরি করতে, ধর কোনও প্রাইভেট ফার্মে, আমি কি পারি না? সুধাময় এত নম্র শীতল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সুধাময় বলতেন তুমি কাজ করবে কেন, বাড়ির কত বড় দায়িত্ব তোমার ওপর। সুরঞ্জন সামজতন্ত্রের কথা শিখছে, ওর জন্য একটু ছাড় দিও। লেখাপড়া করুক, রাজনীতিও করুক, আমার আপত্তি নেই। মায়া যেন উচ্ছন্নে না যায়, দুজনই লেখাপড়া করে মানুষ হোক। তুমি ওদের দেখো। ভেব না। আমি দুবেলা প্রাকটিস করছি, সম্ভব হলে কাছেই কোনও ফার্মেসীতে বসব। পৃথিবীতে কত মানুষ না খেয়ে থাকে, ফুটপাতে থাকে। আমরা তো খেয়ে পরে বেঁচে আছি, ভেব না। সুধাময়ের প্রতি কিরণময়ীর কোনও অভিযোগ নেই, মানুষটি একেবারে অন্য রকম, কারও সঙ্গে মেলে না। কিরণময়ী আর সব সংসারের স্বামীদের তো দেখেছে। সুধাময়ের চেয়ে ভাল কাউকে দেখেনি।

কিরণময়ী মাঝেমধ্যে ভাবে সুধাময় তাকে খুব ভালবাসেন, সঙ্গে না নিয়ে খেতে বসেন না। কিরণময়ীর ঘরের কাজগুলো নিজে তিনি প্রায়ই করে দিতেন। রান্নাঘরে প্রায়ই এসে বলতেন বাসন মাজাটাজা কিছু থাকলে বল, আমি বেশ ভাল বাসন মাজতে পারি। কিরণ তোমার চুলে জট পড়েছে, এস জট ছাড়িয়ে দিই। আজ বিকেলে রমনা ভবনে গিয়ে

ভাল দুটো শাড়ি কিনে এন, ঘরে পরবার শাড়ি তোমার কম বোধহয় তাই না? আমার খুব টাকা হলে তোমার নামে বড় একটি বাড়ি বানিয়ে দিতাম ধানমন্ডিতে, আমি যেন তোমার আগে মরি কিরণ, কিরণ তুমি আমার জীবনে না থাকলে আমি বোধহয় অনেক আগেই মরে যেতাম। কিরণময়ীর শরীরে প্রায়ই বাতের ব্যথা হয়, সুধাময় অনেক রাত জেগে কিরণময়ীর শরীর টিপে দেন। কিরণময়ী মাঝেমধ্যে ভাবে সুধাময় এত তাকে আদর করেন সে কি তাঁর অক্ষমতার জন্য আসলে? একাত্তরে তার পেনিস কেটে নিয়েছিল মিলিটারিরা, সেই থেকে আজ প্রায় একুশ বছর সুধাময় যৌনজীবন যাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম এক মানুষ। এ নিয়ে কিরণময়ীর কাছে তাঁর লজ্জার শেষ নেই। সুধাময় প্রায়ই বলতেন তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কিরণময়ী? চলে যাবার কথা কিরণময়ী কখনও ভাবেনি। দুটো সন্তান রেখে নিজের শরীরের সুখের জন্য অন্য স্বামীর ঘরে যাবার কথা কিরণময়ী কল্পনাও করে না।

একুশ বছর নিজের কথা কিরণময়ী ভাবেনি, আজই বা ভাববে কেন? মেয়েমানুষের জন্মই হয় স্বামী সংসারের সেবার জন্য একথা কিরণময়ী মানে না। কিন্তু একথা তার বিশ্বাস হয়, কারও কারও জন্যে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করলে খুব একটা ব্যর্থ হয় না জীবন। যদি প্রেমে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বড় কোনও স্বার্থত্যাগ সে করে, যদি এতে তার অন্যরকম এক তৃপ্তি হয়, তবে ক্ষতি কি!

www.BDeBooks.Com

৪

উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলবার পর সারা ভারত জুড়ে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তার মাত্রা কমে আসছে ধীরে ধীরে। ভারতে মৃতের সংখ্যা এর মধ্যে আঠারোশ ছাড়িয়ে গেছে। কানপুর ও ভূপালে এখনও সংঘর্ষ চলছে। প্রতিরোধ করতে গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় সেনাবাহিনী নেমেছে। তারা টহল দিচ্ছে। ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত দলগুলোর দরজায় তালা পড়েছে। শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য ঢাকায় সর্বদলীয় স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল হচ্ছে, তাতে কি— ওদিকে সীতাকুণ্ডে মৌলবাদিরা শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে, তিনঘণ্টা ব্যাপী এ অগ্নিকাণ্ডে বারই পাড়ার শতাধিক বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মক আহত হয়েছে সাধনচন্দ্র, মনমোহন দাস। দিনাজপুরে প্রায় একশ দোকানপাটের সাইনবোর্ড ভাংচুর করেছে। দশটি মন্দির, চারটি মিষ্টির দোকান লুট হয়েছে। দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত দুঘন্টাব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চলে। উড়েকালি মন্দিরটিও ভেঙে ফেলা হয়। পিরোজপুরে এ পর্যন্ত বিশটি মন্দির ধ্বংস করা হয়, এর মধ্যে তেরটি পিরোজপুর সদরে, পাঁচটি নিসারাবাদে, একটি মঠবাড়িয়া এবং ভাণ্ডরিয়ায় একটি। সিরাজগঞ্জেও নামাজের পর মিছিল বের হয়, ওরা ঘোষপাড়া কালিবাড়ি ও হিন্দু বাড়িতে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। শাজাদপুর থানার একটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়, কিছু মূর্তিসহ মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। ছাগলনাইয়ার দাঙ্গায় একজন মারাও গেছে, নাম কল্লোল বিশ্বাস। ছাগলনাইয়া থানার শুভপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে বিশ্বাসবাড়ি, মল্লিকবাড়ি ও নন্দীবাড়িতে অতর্কিতে হামলা চলে, লুট হয় কিশোরগঞ্জের সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির ও ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা হয়।

বিরূপাক্ষ শেরপুর থেকে ফিরে বলেছে শেরপুরে একটি মন্দিরও আর আস্ত নেই। সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এবারের দাঙ্গা একাত্তরের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সুরঞ্জন ধমক দিয়ে ওঠে, বিরূ তুমি একে দাঙ্গা বলছ কেন, দাঙ্গা অর্থ জান? দাঙ্গা অর্থ দু দলে মারামারি। এখানে কি দুদলে মারামারি হচ্ছে? মারছে তো একদল আরেক দলকে। এর নাম অত্যাচার বল, নির্যাতন বল।

বিরূপাক্ষ মাথা নেড়ে বলে—ঠিক তাই।

সুরঞ্জনের আজ খুব ফ্রেশ লাগছে। সারাদিন ঘর থেকে তার কোথাও বার হবার নেই। হিন্দুরা সব ঘরে লুকিয়ে আছে, সেও লুকিয়ে থাকবে। সাহস দেখিয়ে ঘুরে

বেড়াবার প্রয়োজনটাই বা কী, কী লাভ ওতে, রাস্তাঘাটে মেরে ফেলে রাখবে, তখন? মূর্খ লোকের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেবে না সুরঞ্জন। সুরঞ্জন আজ সাতদিন পর স্নান করেছে। বাইরে তার ঝুলকালি যা ছিল, দূর হয়েছে। সকাল থেকে অনেকে এসেছে, কাজল দেবনাথ এসেছিলেন, পার্টি অফিস থেকে মতিলাল, মানিক, আফজাল, ফরহাদ এসেছিল, পুলকও এসেছিল— সকলে জানে মায়া ফেরেনি। মায়া ফেরেনি এই খবর শুনে চুকচুক করে দুঃখ করে গেছে সকলে। ওঘর থেকে খানিক পর পরই মিহি সুরে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। কিরণময়ী কাঁদে, সুধাময়ের কান্নায় কোনও শব্দ হয় না। আর সুরঞ্জন এখন স্থির করেছে সে কাঁদবে না। সে ঠা ঠা করে পাড়া কাঁপিয়ে হাসবে।

প্রতিবেশি গোপালদের বাড়ি লুট হয়েছে, ওদের বাড়ির এক মেয়ে দশ বারো বছর বয়স হবে, বাড়ি এসে সেদিন কিরণময়ীকে বলেছে, মাসিমা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমরা মিরপুরে বাড়ি নিয়েছি। কিরণময়ী মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মিরপুরের বাড়ি কি লুট হবে না মা? তবু ভাল থেক।

মেয়েটি কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যায়। সুরঞ্জন শুয়ে শুয়ে মেয়েটিকে দেখে। কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি মেয়ে?

মাদল।

তুমি স্কুলে পড়?

হ্যাঁ।

তোমাদের বাড়িতে যখন ওরা ঢুকেছিল, তুমি তখন কি করছিলে?

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলাম।

ওরা আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র লুট করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন কাঁদিস কেন বলে একটা লোক আমার গালে জোরে দুটো চড় মেরেছিল।

আর কিছু করেনি? তোমাকে ধরে নিতে চায়নি?

না।

সুরঞ্জন ভাবে, মায়ার বয়স যদি আরও কিছু কম হত, অথবা আরও কিছু বেশি তবে বোধহয় ও বেঁচে যেত। ওকে টেনে হিঁচড়ে কেউ নিত না। হায়দারও আর আসেনি এ বাড়িতে, সুরঞ্জনও যায়নি। হায়দার সম্ভবত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। সুরঞ্জনও বুঝেছে মায়াকে খোঁজাখুঁজি করা বৃথা, মায়া যদি ফেরত আসে, আসবে। সেই ছ বছর বয়সের মত ফেরত আসবে। তা না হলে প্রকৃতিই জানে অতঃপর এই সংসারের গতি কোন দিকে ঘুরবে।

বন্ধুরা জানিয়ে গেছে ভোলার অবস্থা খুব খারাপ। টুঙ্গিপাড়া থানার পাটগাতি, চিংগুরিয়া, কাকুইবুনিয়া, নেবুখালি ও বাগুরিয়া গ্রামে মোট নব্বইটি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আফজাল বলেছে টুঙ্গিপাড়া আর শেরপুরে দাঙ্গা করিয়েছে বিএনপির এমপিরা। আওয়ামী লীগ পাশ করে এসব জায়গা থেকে, আওয়ামী লীগের ওপর জনগণ যেন আর ভরসা না করে তাই এই ষড়যন্ত্র। কারণ রাতে ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে দিনের

www.BDeBooks.Com

বেলা ভাল মানুষ সেজে ওরাই বলে, কোথায় এখন তোমাদের প্রিয় নেতা? তোমাদের এই বিপদ থেকে তারা তো রক্ষা করছে না। শেখ হাসিনা সর্বদলীয় সমাবেশে বলেছেন স্বাধীনতার একুশ বছর পরও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমাদের সমাবেশ করতে হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখজনক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিছিলে শ্লোগান উঠেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের রুখবে এবার বাংলাদেশ। আহা বাংলাদেশ। সুরঞ্জন সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাংলাদেশকে বিশ্রি একটা গালি দেয়, বলে শালা শুয়োরের বাচ্চা বাংলাদেশ। গালিটি সে বারবার উচ্চারণ করে। তার বেশ আনন্দ হয়। হেসেও ওঠে হঠাৎ হাসিটিকে নিজের কাছেই বড় ক্রুর মনে হয়।

আজ বিজয় দিবস। সারাদেশ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান করছে, আলোকসজ্জা করছে, কুচকাওয়াজ করছে। দেশে বেশ আনন্দ হচ্ছে। সুরঞ্জন এই আনন্দের সঙ্গে নিজের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করে না। হায়দার এবার আসেনি তাকে নিতে, সম্ভবত ভেবেছে এর বাবার অসুখ, বোন অপহৃত, এ কি আর আনন্দে আগের মত মাতবে, এ এখন বাতিলের খাতায়। হ্যাঁ সুরঞ্জন এখন বাতিলের খাতায়। সে গত দুদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ভেতর ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ খুব একটা করেনি। কিরণময়ীর কাছে পুলকের কাছে থেকে আনা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলেছে, কাজে লাগিও অবশ্য এ আমার রোজগারের টাকা নয়, ধার করা। কিরণময়ী নিঃশব্দে সুরঞ্জনের টেবিলে দুবেলা খাবার রেখে যায়, সুরঞ্জনের মাঝেমধ্যে রাগও ধরে মানুষটি কি পাথর? তার স্বামী এখন পঙ্গু, তার কন্যা হারিয়ে গেছে, পুত্র থেকেও নেই, তার কেন তবু অভিযোগ নেই কারও প্রতি। মৃত মানুষের মত অভিযোগহীন, অনুভবহীন একটি আশ্চর্য নিথর জীবন কিরণময়ীর।

সুরঞ্জন রাত আটটার দিকে আজ বাড়ি থেকে বেরোয়। একটি কাজ করবার উৎসাহ জাগে তার . সে ভাবে সে এই কাজটি আজ করবেই। এই কাজটি না করলে তার শরীরের পতি লোমকূপে গোপন একটি আগুন জ্বলছে, তা নিভবে না। এই কাজটি না করলে একটি শ্বাসরুদ্ধকর জীবন থেকে সে মুক্তি পাবে না, এই কাজটি হয়ত কোনও সমস্যার সমাধান নয় তবু এই কাজ তাকে স্বস্তি দেবে, এই কাজ করে সে তার ক্রোধ, তার ক্ষোভ, তার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কমাবে।

সুরঞ্জন একটি রিক্সা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে যায়, আজ নগরীতে উৎসব। শাপলা চত্বরে এসে ডানে তাকায়, ও পাশেই ইন্ডিয়ার হাইকমিশনের লাইব্রেরিটি, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বইয়ের লাইব্রেরি। সুরঞ্জনের মনও পুড়েছে এবার। সে রিক্সাকে প্রেসক্লাবের দিকে সোজা যেতে বলে। মায়াকে ফেরত পাওয়ার আশা সুরঞ্জন ছেড়েছে, সুধাময় আর কিরণময়ীকে জানিয়ে দিয়েছে মায়ার আশা যেন তারা না করে। মায়া সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বলেই যেন তারা ভাবে।

তারা কী ভাবছে সুরঞ্জন জানে না। সুধাময়ের সামনে গিয়ে একসময়ের সচল সক্ষম মানুষের এমন নিঃস্ব, নির্জন, অসহায় অবস্থা দেখে সুরঞ্জনের সহ্য হতে চায় না। সুরঞ্জন

রিক্সাকে বার কাউন্সিলের মোড়ে থামায়। থামিয়ে সিগারেট ধরায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি, হেঁটে হেঁটে একটি মেয়ে আসে, সুরঞ্জন ডাকে, এই।

বলতেই মেয়েটি রিক্সার পাশে এসে দাঁড়ায়, হাসে।

সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি।

মেয়েটির বয়স উনিশ বিশ হবে। মুখে রঙ মাখিয়েছে, কিন্তু চেহারায় এক ধরনের সারল্য আছে। মেয়েটি হেসে বলে, পিংকি।

পুরো নাম বল।

শামীমা আক্তার।

বাবার নাম?

আবদুল জলিল।

বাড়ি?

ফেনী

কি নাম যেন তোমার?

শামীমা।

ঠিক আছে রিক্সায় ওঠ। শামীমা রিক্সায় ওঠে রিক্সাওয়ালাকে টিকাটুলির দিকে যেতে বলে সুরঞ্জন।

শামীমার সঙ্গে সারা রাস্তা সুরঞ্জন আর কোনও কথা বলে না। তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। এই যে মেয়েটি গা ঘেঁষে বসেছে, অযথা কথা বলছে, হাসতে হাসতে ঢলে পড়তে চাইছে সুরঞ্জনের গায়ে— সুরঞ্জনকে এসব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে খুব মন দিয়ে সিগারেট ফোঁকে। নিজের ঘরটি বাইরে থেকে তালা দিয়ে এসেছে সুরঞ্জন। সদর দরজায় ডাকাডাকি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়া যায়। সুরঞ্জন ঘরে ঢোকে, পেছনে শামীমাও। সুরঞ্জন আজ যা করছে, সুস্থ মাথায় করছে। সে আজ কোনও রকম নেশা করেনি। তার মস্তিষ্ক কোনও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ঘরে ঢুকে শামীমা একটু জোরে জোরেই কথা বলতে শুরু করে, সুরঞ্জন তাকে থামিয়ে বলে, চুপ। একটি কথা নয়। একেবারে চুপ।

ওঘর থেকে কোনও শব্দ আসে না। সম্ভবত ঘুমিয়ে গেছে ওরা, অবশ্য কান পেতে রাখলে টের পাওয়া যায় সুধাময় গোঙাচ্ছে। তারা কি বুঝতে পেরেছে তাদের মেধাবী পুত্রধন ও বাড়িতে একটি বেশ্যা নিয়ে ঢুকেছে। সুরঞ্জন অবশ্য শামীমাকে কোনও বেশ্যা ভাবছে না। ভাবছে একটি মুসলমান মেয়ে। একটি মুসলমান মেয়েকে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ধর্ষণ করতে।

শামীমাকে ধর্ষণ করবে সে। স্রেফ ধর্ষণ। সে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেয়। শামীমার শাড়ি কাপড় টেনে খুলে ফেলে, তার শ্বাস দ্রুত হয়, ধাক্কা দিয়ে শামীমাকে মাটিতে ফেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরঞ্জন। এর নাম আদর সোহাগ নয়, সুরঞ্জন বুঝতে পারে সে অযথাই মেয়েটির চুল ধরে হেঁচকা টান দিচ্ছে, সে মেয়েটির বুকের মধ্যে জোরে কামড় বসাচ্ছে, মেয়েটির তলপেটে, পেটে, উরুতে, ধারালো নখের আঁচড় দিচ্ছে। মেয়েটিকে

www.BDeBooks.Com

তছনছ করে সুরঞ্জন ধর্ষণ করল। মেয়েটিও সম্ভবত এমন অদ্ভুত হিংস্র খদ্দের দেখেনি যে তাকে এমন কামড়ে ছেঁড়ে। শামীমা কাপড় চোপড় গুটিয়ে দাঁড়ায়। সুরঞ্জন বড় শান্ত এখন। এই মেয়েটিকে এখন লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলে তার আনন্দ হবে। তার শ্বাস আবার দ্রুত হয়, সে গলাধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ঘরের বার করে দেবে ভাবে। তার বারবার মায়াকে মনে পড়ছে, মায়াকে কি ওরা সাতজনই ধর্ষণ করেছে? মায়ার খুব কষ্ট হয়েছে বোধহয়? মায়া খুব চিৎকার করেছে বোধহয়। মায়ার চিৎকার কি কেউ শুনতে পায়নি? একটি প্রাণীও নয়? মায়া এই শহরের কোথায় আছে এখন? ছোট্ট একটি শহর অথচ সে জানে না তার প্রিয় বোনটি আস্তাকুঁড়ে পতিতালয়ে না বুড়িগঙ্গার জলে। কোথায় মায়া?

মেয়েটি সম্ভবত ভয় পেয়েছে সুরঞ্জনের আচরণে। কাপড়চোপড় দ্রুত পরে নিয়ে বলে, টাকা দেন।

খবরদার এক্ষুণি বের হ, সুরঞ্জন ধমক দেয়।

শামীমা দরজার দিকে এগোয়। সে আবার করুণ চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে। বলে, দশটা টাকা অইলেও দেন। সুরঞ্জনের সামান্য মায়া হয়। দরিদ্র একটি মেয়ে। সে হয়ত আজকের টাকা দিয়ে চাল কিনবে, ভাত রেঁধে খাবে। সুরঞ্জন প্যান্টের পকেট থেকে দশটি টাকা শামীমাকে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

তুই তো মুসলমান, না?

হ্যাঁ।

তোরা তো আবার নাম পাল্টাস। নাম পাল্টাস নি তো।

না।

যা।

শামীমা চলে যায়। সুরঞ্জনের মনে বড় আরাম হয়। সে আর কোনও দুঃখ করবে না আজ। আজ বিজয়ের দিন, আজ সকলে আনন্দোল্লাস করছে। একুশ বছর আগে এই দিনে স্বাধীনতা এসেছিল, এই দিনে শামীমা আক্তারও এসেছে সুরঞ্জন দত্তের ঘরে। বাহ্ স্বাধীনতা বাহ্। শামীমাকে একবারও বলা হয়নি তার নাম। তার নাম যে সুরঞ্জন দত্ত একথাটি শামীমাকে বলা উচিত ছিল, তবে শামীমাও টের পেত তাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করেছে যে মানুষ, সে একটি হিন্দু যুবক। হিন্দুরাও ধর্ষণ করতে জানে, তাদেরও হাত পা মাথা আছে, তাদেরও দাঁতে ধার আছে, তাদের নখও আঁচড় কাটতে জানে। শামীমা নিতান্তই নিরীহ একটি মেয়ে, তবু তো মুসলমান। মুসলমানের গালে এখন একটু চড় কষাতে পারলেও সুরঞ্জনের আনন্দ হয়।

সারারাত কেটে যায় ঘোরে বেঘোরে, সারারাত কেটে যায় সুরঞ্জনের একা, ভুতুড়ে নিস্তব্ধতায়, নিরাপত্তাহীনতায়, সন্ত্রাসের ডানার নিচে সুরঞ্জন একটি ছোট্ট, অতি তুচ্ছ প্রতিশোধ নিতে চায়, পারে না। সারারাত ধরে শামীমা মেয়েটির জন্য তার মায়াই হয়,

করুণা হয়। হিংসে হয় না। রাগও হয় না। যদি নাই হয় তবে আর প্রতিশোধ কিসের। তবে তো এ এক ধরনের পরাজয়। সুরঞ্জন কি পরাজিত? সুরঞ্জন তবে পরাজিতই। শামীমাকে সে ঠকাতে পারেনি। কারণ শামীমা এমনিতেই ঠকে আছে। তার কাছে সম্ভোগ আর ধর্ষণ আলাদা কোনও আচরণ নয়। সুরঞ্জন কুঁকড়ে যেতে থাকে বিছানায়, যন্ত্রণায় লজ্জায়। গায়ের লেপখানা সে ফেলে দেয় মেঝেয়। বিছানার চাদর দলা পাকিয়ে আছে, সুরঞ্জন ময়লা তোষকের ওপর হাঁটুর কাছে মাথা নামিয়ে এনে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। সকাল হয়েছে, এই কথা জানাতে কিরণময়ী দরজায় শব্দ করে। সুরঞ্জন কথা বলে না। তার খুব প্রস্রাবের বেগ হয়। তবু উঠতে ইচ্ছে করে না। কিরণময়ী চা নিয়ে এসেছে, সকালে দুকাপ চা বানাতে হয়, এক কাপ সুরঞ্জনের, সুধাময় আর মায়া কখনও চা খায় না, এক কাপ কিরণময়ীর। সুরঞ্জন জানিয়ে দেয় সে চা খাবে না। সে উঠে স্নান করবে, তার জন্য যেন গরম জল দেওয়া হয় বাথরুমে। কিরণময়ী অগত্যা জল গরম করে।

সুরঞ্জন বিছানা ছাড়ে সকাল দশটায়। তার চা নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকে রান্নাঘরে। সে কখন খায়, না খায় কিরণময়ীও বুঝতে পারে না। সুরঞ্জন নিজের ওপর অত্যাচার করতে ভালবাসে খুব। দেখা যায় কখনও সিগারেট আর চা খেয়ে সারা দিন পার করছে। ভাত স্পর্শ করছে না। এ নিয়ে কিরণময়ী কিছু বলতে এলে সুরঞ্জন সোজা বলে দেয়—আমি এখন বড় হয়েছি। আমি কি করব, কি খাব, কখন খাব, আদৌ খাব কিনা—এই দায়িত্ব তোমার নয়, আমার।

বাড়ির সকলে এ কথা মনে মনে বিশ্বাস করছে মায়া আর ফিরবেনা। কে একজন সেদিন বাড়ি এসে খবর দিয়ে গেছে গেণ্ডারিয়া লোহার পুলের নিচে মায়ার মত একটি মেয়েকে ভেসে থাকতে দেখেছে। থানায় জিডি এন্ট্রি করেছে সুরঞ্জন, সন্দেহের লোক হিসেবে রফিক নামের একটি ছেলের কথা বলেছে। থানার লোকদের দেখে মনে হয়নি একাজে তারা অগ্রসর হবে। কারণ যখন নাম জিজ্ঞেস করেছিল সুরঞ্জন চটপট বলেছিল, নাম সুরঞ্জন দত্ত।

ও। থানার ওসি মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড়খানা ওপর নিচে এমন দোলালেন যে তিনি বুঝে ফেলেছেন এটি কেবলই লেখার লেখা।

সুরঞ্জন সকালে টুথ ব্রাশে পেস্ট নিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায়। গতকাল বিজয় দিবস গেল। একসময় এই দিবস পালন করবার প্রস্তুতি একমাস আগে থেকে নেওয়া হত। সুরঞ্জন উদীচীতে গান গাইত, গণসঙ্গীতের গলা তার ভাল, বেশ ভরাট, গমগম করে। আর এবার তার বিজয় দিবস পালন সবচেয়ে অন্যরকম। সুরঞ্জন গত রাতের বিজয় উদযাপনের কথা ভাবছে, এমন সময় দেখে হায়দার হাঁটছে রাস্তায়। সুরঞ্জনকে দেখে সে সম্ভবত ভদ্রতাবশত দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ।

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জন দাঁত মাজতে মাজতেই বলে, ভাল। এর পরই মায়ার প্রসঙ্গ উঠবার কথা, কিন্তু হায়দার সে প্রসঙ্গ তোলে না। সে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, বলে গতকাল শিবিরের লোকেরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে যে গণকবরের স্মৃতিফলক ছিল তা ভেঙে দিয়েছে।

গণকবর মানে? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

গণকবর মানে তুমি জানো না? হায়দার অবাক চোখে তাকায় সুরঞ্জনের দিকে।

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে, সে জানে না। হায়দার অপমানিত হয়। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, একসময় সে বলে, চলি; ও, পারভিন এখন এখানে, ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে।

সুরঞ্জন শোনে, বিনিময়ে কিছু বলে না। পারভিনের ডিভোর্স হওয়াতে তার কোনও কষ্ট হয় না। বরং মনে হয় বেশ হয়েছে, মজা বোঝ। হিন্দুর কাছে বিয়ে দাওনি, মুসলমানের কাছে দিয়েছ, এখন কেমন? পারভিনকে সে মনে মনে একবার রেপ করে। এই সকালে, দাঁত মাজা অবস্থায় রেপ তেমন স্বাদের হয় না, তবু মনে মনে রেপ-এ স্বাদ থাকে।

শিবিরের লোকেরা গণকবরের স্মৃতিফলক ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিক। শিবিরের লোকের হাতে এখন অস্ত্র, অস্ত্র তারা কাজে লাগাচ্ছে, তাদের কে বাধা দেবে। ধীরে ধীরে একদিন তারা ভেঙে ফেলবে অপরাজেয় বাংলা, ধোপার্জিত স্বাধীনতা, ভেঙে ফেলবে সাবাস বাংলাদেশ, জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা। এতে কে বাধা দেবে। দু একটা মিছিল মিটিং হবে। জামাত শিবির যুবকমান্ডের রাজনীতি বন্ধ হোক বলে শ্লোগান উঠবে। পাকিবাদের ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল দলগুলো রাস্তায় নেমে চিৎকার করবে। এতে কি হবে? সুরঞ্জন মনে মনে বলে কচু হবে।

সুধাময় এখন উঠে বসতে পারেন। পেছনে বালিশ রেখে বসে * দহীন বাড়িটির শব্দ শোনেন। সুধাময়ের মনে হয় এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশি বেচে থাকবার সাধ ছিল মায়ার। মায়া দাঙ্গার খবর পেয়ে নিজেই নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল, আসতে হল সুধাময়ের জন্যই। সুধাময়ের এই দুর্ঘটনাটি না ঘটলে মায়াকে আসতে হয় না, নিখোঁজও হতে হয় না। সুরঞ্জনকে অনেকদিন পর কাছে ডাকেন সুধাময়। পাশে বসতে বলেন। বন্ধ জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দরজার জানালা বন্ধ করে থাকতে বড় লজ্জা হয়।

সুরঞ্জনের বলবার কিছু থাকে না। সেও উদাসিন তাকিয়ে থাকে শূন্য ট্রলির দিকে, এই ট্রলিতে টেলিভিশনটি ছিল, নিয়ে গেছে। কিরণময়ী গোপনে সোনা জমাত, সম্ভবত সেনবালা বা কমলাবতী মাসির কাছে কিরণময়ী শিখেছিল অল্প অল্প করে কিছু জমিয়ে রাখবে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ভেবে। কিরণময়ীর যক্ষের ধনে হাত পড়েছে এবার, সেবার এ সম্পদটুকু নিয়ে কামালের বাড়ি উঠেছিল বলে সে যাত্রা রক্ষা পায়। অবশ্য এ

বাড়ির জিনিসপত্র ঘরের বাইরে বের করে কারা যেন পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবার কিরণময়ীকে শূন্য করে দিয়েছে এদেশের সুযোগ্য সন্তানেরা।

সুধাময় বলেন, তোর জন্য বড় দুশ্চিন্তা হয়।

কেন?

তোকে না আবার কবে মেরে ফেলে, রাত করে ঘরে ফিরিস। যখন তখন বাইরে বেরিয়ে যাস। কাল হরিপদ এসেছিল, ভোলায় নাকি খুব খারাপ অবস্থা, হাজার হাজার লোক এখন আকাশের নিচে বসে আছে, মাইলের পর মাইল হিন্দু জেলেদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। মানিকগঞ্জের একটি মন্দিরও অক্ষত নেই। গ্রামগুলোর হিন্দুঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মেয়েদের অবাধে রেপ করেছে।

সুরঞ্জন হেসে বলে, এসব কি নতুন খবর?

নতুন খবর হয়ত নয়। কিন্তু তোকে নিয়ে যে ভয় সুরঞ্জন।

আমাকে নিয়েই ভয়? কেন তোমাকে আর মাকে নিয়ে ভয় নেই? তোমরা হিন্দু নও?

আমাদের আর কী করবে?

তোমাদের মুণ্ডু কেটে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। এখনও চেন নি এ দেশের মানুষকে। হিন্দু পেলেই ওরা নাস্তা করবে, বুড়ো ছেলে মানবে না।

জেনারালাইজ করছিস কেন? এ দেশের মানুষ কি রাস্তায় নামছে না, প্রতিবাদ করছে না, কাগজে তো বিস্তর লেখালেখিও হচ্ছে।

এসব করে ছাই হবে।

এসবও হচ্ছে ওদের ষড়যন্ত্র। দা কুড়োল নিয়ে নেমেছে একদল। তাদের বিরুদ্ধে হাত উঁচিয়ে ক্ষীণ স্বরে শহর প্রদক্ষিণ করলে দাকুড়োলের ধার কিছু কমবে? সুরঞ্জন অনুমান করে এই দেশ একদিন ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নামটি উঠে যাবে, দেশে বিরাজ করবে শরিয়তি আইন, মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় বেরোবে, টুপিদাড়ি পাঞ্জাবিঅলা লোক বেড়ে যাবে দেশে, দেশে স্কুল কলেজের বদলে শনৈ শনৈ বাড়বে মসজিদ মাদ্রাসা সংখ্যালঘুদের নীরবে ধ্বংস করে ফেলা হবে। সুরঞ্জন ভেবে শিউরে ওঠে।

সুধাময়ের চুলে এক'দিন আরও পাক ধরেছে। গাল ভেঙে গেছে, স্বাস্থ্য প্রায় অর্ধেক নেমে এসেছে। সুধাময় বলতে চান, এখনও তো অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলছে। এই শক্তিটি কি সব দেশে আছে? প্রতিবাদ করবার অধিকার?

একাত্তর থেকে কুনো ব্যাঙের মত ঘরে বসে আছেন সুধাময়। আন্দোলন দেখলেই প্রতিবাদ-প্রতিশোধের শব্দ শুনলেই ঘরে এসে দরজায় খিল দিতে হয়। কারণ তাঁর বেলা রিস্ক বেশি। মুসলমানরা অসংকোচে দাবি আদায়ের শ্লোগান দিতে পারে, হিন্দুরা তা পারে না। হিন্দুকে বেশি মারমুখো হতে দেখলে বিরুদ্ধশক্তি তা সহ্য করবে না। আহমদ

www.BDeBooks.Com

শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা করেও বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সুধাময় একটু উল্টোসিধে কথা বললেই কতল হয়ে যেতে হয়। সুধাময় অনেকদিন পর সুরঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে বলে, মায়াকে কি কোথাও পাওয়া যাবে না খুঁজে?

জানি না।

কিরণময়ী তো সেই থেকে একটি রাতও ঘুমোয় না। আর ওর সবচেয়ে বেশি চিন্তা এখন তোকে নিয়ে। তোর কিছু হলে....

মরে গেলে মরে যাব। কত লোকই তো মরছে।

দিনে চারবেলা নিজের হাতে কিরণময়ী আমার হাত পায়ের এক্সারসাইজ করিয়ে জোর ফিরিয়ে আনছে। দাঁড়াতে না পারলে রোগী দেখাও তো সম্ভব নয়। চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। তুই একটা চাকরি বাকরি...

আমি পরের গোলামি করব না

সংসারটা আসলে..... আমাদের সেই জমিদারিও তো নেই আর। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরুর স্বাদ আমরা পেয়েছি। তোদের কালে ছিল অভাব দেখলি। আর গ্রামের জমিজমা নিরাপত্তার অভাবে কবেই বিক্রি করে ফেলেছিলাম। সেগুলো থাকলেও তো অন্তত শেষ বয়সে গ্রামে গিয়ে বাকি জীবন পার করা যেত।

সুরঞ্জন থমকে ওঠে অশিক্ষিতের মত কথা বলছ কেন? গ্রামে গিয়েই বা তুমি বাঁচতে পারতে নাকি? ওখানে মাতব্বরের লেঠেলরা তোমার মাথায় বাড়ি দিয়ে সব কেড়ে নিত।

সুরঞ্জন থমকে ওঠে অশিক্ষিতের মত কথা বলছ কেন? গ্রামে গিয়েই বা তুমি বাঁচতে পারতে নাকি? ওখানে মাতব্বরের লেঠেলরা তোমার মাথায় বাড়ি দিয়ে সব কেড়ে নিত।

দেশে কি দু একটা ভাল লোকও নেই সুরঞ্জন?

না নেই।

তুই অযথা হতাশায় ভুগছিস।

অযথা নয়।

তোর বন্ধুবান্ধব? এতকাল যে কম্যুনিজমের ওপর লেখাপড়া করলি, আন্দোলন করলি, যাদের সঙ্গে চললি ফিরলি ওরা ভাল মানুষ নয়?

না। কেউ নয়। সবাই কম্যুনাল।

আমার মনে হয় তুইও কিছু কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছিস।

হ্যাঁ যাচ্ছি। এই দেশ অত্যন্ত সচেতনভাবে আমাকে কম্যুনাল করছে। আমার দোষ নেই।

সারাদিন ঘরেই বসে রইল সুরঞ্জন। দুপুরের দিকে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াল সারা বারান্দায়। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে একটি ম্যাচ নিয়ে এসে ঘরের সব বই-এর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুন লাগিয়ে দিল সুরঞ্জন। সামনে মোড়া পেতে বারান্দায় বসে সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিরণময়ী দৌড়ে এসে সে যজ্ঞের সামনে দাঁড়াতেই সুরঞ্জন হেসে বলল, আগুন তাপাবে? এস।

কিরণময়ী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?

হ্যাঁ মা। অনেকদিন ভাল মানুষ ছিলাম তো, এবার পাগল হচ্ছি। পাগল না হলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না।

কিরণময়ী দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বইয়ের পর বই পুড়ে যেতে দেখল। সুধাময় ঘর থেকে চেঁচালেন, বাবা থাম, থাম, এত রাগ কেন তোর? তুই নিজের ক্ষতি করছিস।

সুধাময়ের আদর্শ ধুয়ে সুরঞ্জন আর জল খাবে না। সুদাময় এককালের বামপন্থী বিশ্বাসের মানুষ। সুরঞ্জনকেও গড়ে তুলেছিলেন একই ধারায়। সুরঞ্জন এসব এখন আর বিশ্বাস করে না। সে অনেক বামপন্থীকেও তাকে গাল দিতে দেখেছে 'শালা মালাউন' বলে। মালাউন শব্দটি সুরঞ্জন স্কুল থেকে শুনে আসছে। ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক লাগলেই ওরা দু'এক কথার পরই বলত মালাউনের বাচ্চা। সুরঞ্জন যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, ফারুক নামের এক বন্ধু টিফিন পিরিয়ডে তাকে ডেকে নিয়ে বলছিল, টিফিনবক্সে আমি খুব মজার একটি খাবার এনেছি, আর কাউকে দেব না, তুই আর আমি ছাদের সিঁড়িতে বসে খাব, কেমন? সুরঞ্জন ক্ষুধার্ত ছিল না, কিন্তু তার কাছে এই প্রস্তাব মন্দ লাগেনি। টিফিনবক্স নিয়ে ছাদের সিঁড়িতে উঠে এল ফারুক, পেছনে সুরঞ্জন। ফারুক বলল, নে। একটি কাবাব দিল হাতে। সুরঞ্জন খেল। একটি নিয়ে ফারুকও খেল। খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফারুক সজোরে আনন্দধ্বনি দিল—হুররে। সে নিচে নেমে ক্লাসঘরের সকলকে জানিয়ে দিল সুরঞ্জন গরু খেয়েছে। সকলে হৈ হৈ করে নাচতে লাগল। সুরঞ্জনকে কেউ চিমটি কাটে, কেউ মাথায় চাটি মারে, কেউ জামা ধরে টান দেয়। সুরঞ্জন লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গাল বেয়ে টপটপ জল ঝরছিল।

গরুরমাংস খেয়েছে বলে তার এতটুকু গ্লানি হচ্ছিল না, গ্লানি হচ্ছিল তাকে ঘিরে জান্তব উল্লাস দেখে। সে খুব বিচ্ছিন্ন বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে এদের বাইরে। এই বন্দুরা একরকম মানুষ, আর সে আরেক রকম।

বাড়ি ফিরে সে কী কান্না সুরঞ্জনের! সুধাময়কে বলল, বাবা ওরা আমাকে ষড়যন্ত্র করে গরুর মাংস খাইয়ে দিয়েছে।

শুনে সুধাময় হেসে বললেন, এর জন্য কাঁদতে হয় নাকি। গরুর মাংস তো ভাল খাবার। কালই আমি বাজার থেকে কিনে আনব, দেখিস। সকলে মিলে খাব।

কিরণময়ী রেঁধেছিল গরুর মাংস। সহজে কি রাঁধতে চায়, কিরণময়ীকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত সুধাময়ী বুঝিয়েছিলেন যে, এই সব কুসংস্কারের কোনও মানে হয় না। অনেক বড় বড় মনীষী এই সব সংস্কার মানতেন না। সুরঞ্জনের ধীরে ধীরে কেটেছিল ছোটবেলার লজ্জা, ভয়, ক্ষোভ, সংস্কার। পরিবারের শিক্ষক ছিলেন সুধাময়। সুরঞ্জনের মনে হয় তার বাবা অতিমানব গোছের কিছু হবেন। এত সততা, এত সারল্য, এত আদর্শ নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা যায় না।

বাড়িতে রেডিও টেলিভিশন কিছু নেই। থাকলে সুধাময় অন্তত খবরগুলো শুনতে পেতেন। রাতে হঠাৎ হঠাৎ তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেন, দেখেন মায়াকে একটি বাক্সের মধ্যে

www.BDeBooks.Com

কারা যেন লুকিয়ে রেখেছে। মায়া চিৎকার করছে, কাঁদছে। বেচারা মায়া, দেখতে দেখতে তরতর করে বড় হয়ে গেল। সে যে বড় হয়ে গেছে, হিন্দু মেয়ে, বড় হয়ে গেলে হিন্দু মেয়েদের যে নিরাপত্তা দরকার তা মনে পড়েনি সুধাময়ের। তিনি এখন শোক করতেও ভুলে গেছেন। কিরণময়ীও কথা বলে না, রোবটের মত কাজ করে যায়, সুধাময়কে ওষুধ খাওয়ায়, ভাত চড়ায়, সে যে জ্যান্ত একটি মানুষ, সুখদুঃখ ধারণ করে— এ মনে হয় না। মায়া যে তার মেয়ে ছিল, নিজেও যেন ভুলে গেছে। কিরণময়ী সুধাময় সুরঞ্জন সকলেই এক একটা পাথর হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক শক্তির হামলায় সারাদেশে আঠাশ হাজার ঘরবাড়ি আড়াই হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এবং সাড়ে তিন হাজার মন্দির ও উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোলায়, মানিকগঞ্জে, সীতাকুণ্ড, মীরেরসরাই, কক্সবাজার, কুতুবদিয়ায় মোট দু'লক্ষ লোক সবকিছু হারিয়ে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দু'হাজার চারশ নারী নির্যাতিতা হয়েছে এবং মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ একশ বিয়াল্লিশ কোটি টাকা।

সুধাময় চৌষট্টিতে শ্লোগান দিয়েছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। সেদিনের সেই দাঙ্গা বাড়তে পারেনি, শেখ মুজিব এসে থামিয়েছিলেন আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেন বেশি বাড়তে না পারে সে জন্যই দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল সরকার নিজে। সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করল। সুধাময় ছিলেন মামলার একজন আসামী। সুধাময় অতীত নিয়ে ভাবতে চান না, তবু অতীত এসে চোখের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। কী পেয়েছে সে এ জীবনে, সব হারানো ছাড়া!

সুধাময়ের হারাবার ছাড়া কিছু নেই। চোখের সামনে আবারও ভেসে ওঠে ১৯৮৯ সালের ক'টি ঘটনা। কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার সবাহন গ্রামে গত আটই ফেব্রুয়ারি ভোরে হিন্দু ঋষি সম্প্রদায়ের ওপর আশেপাশের গ্রামের প্রায় চারশতাধিক লোক অতর্কিতে হামলা চালায়। দুষ্কৃতকারিরা ঘোষণা করে— থাকতে হলে তাদের মুসলমান হতে হবে, তা না হলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা ঋষি সম্প্রদায়ের প্রতিটি ঘর লুঠ করে আগুন লাগিয়ে মন্দির ধূলিসাৎ করে। অনেককে ধরে নিয়ে যায়, চট্টগ্রামের রাউজান থানার গশ্চি গ্রামের বৈদ্যবাড়িতে দিনের বেলা বোমা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়ে প্রায় দেড়শ জন লোক আহত করে।

শুধু কি তাই? সুধাময়ের আরও মনে পড়ে খুলনার দিঘলিয়া থানার গাজিরহাটে পারকোটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলেছে। তাদের চাষাবাদে বাধা দেওয়া হয়, মাঠের ফসল ও গরুছাগল নিয়ে যায়, দোকান লুট করে। টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানার বিমুখী গ্রামের প্রাচীন মন্দিরে শ্বেতপাথরের শিব রাধাগোবিন্দ, অন্নপূর্ণা মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা চুরি হয়। বিগ্রহ উদ্ধার হয়নি এবং কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এর আগেও ওই মন্দির থেকে অষ্টধাতুনির্মিত নারায়ণ ও রুপার লক্ষীমূর্তি চুরি

হয়েছিল। ভোলার লালমোহন থানার মদনমোহন আখড়ায় নাম সংকীর্তনের সময় সাম্প্রদায়িক লোকেরা কীর্তনমণ্ডপে হামলা চালায়। তারা মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে। এ তো গেল নিতান্তই ছোট কটি ঘটনা। এবার যা ঘটেছে তার তুল্য কিছু হতে পারে না। এবার ছেচল্লিশ, পঞ্চাশ, চৌষট্টি, নব্বই সব দাঙ্গার বড় দাঙ্গা হয়েছে, সুধাময় টের পাচ্ছেন।

লোকে বলত আওয়ামী লীগ হিন্দুদের বাঁচাবে। আওয়ামী লীগের ওপরও এখন আর আস্থা রাখতে পারেন না সুধাময়। আইয়ুব খানের শত্রুসম্পত্তি আইন আওয়ামী লীগের আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর আবার সংসদে বহাল করেন। নাম বদলে এটি এখন শত্রুসম্পত্তি আইন হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সুধাময় একথা বিশ্বাস করেন অর্পিত সম্পত্তি আইনটি যতদিন এইদেশে থাকবে ততদিন হিন্দুদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করা হবে।

দেশ জুড়ে যে হিন্দুরা চলে গেছে, তাদের সম্পত্তিকে বলা হয় শত্রুর সম্পত্তি। সুধাময় ভাবেন তাঁর কাকা, জ্যেঠা, মামারা কি দেশের শত্রু ছিল? এই ঢাকা শহরে জ্যেঠা, মামাদের বড় বড় বাড়িঘর ছিল, সোনারগাঁয়ে ছিল, নরসিংদি, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুরে ছিল, এগুলো কোনওটি কলেজ হয়েছে, কোনওটি হয়েছে সরকারি। অফিস। অনিল কাকার বাড়িতে ছোটবেলায় অনেকদিন বেড়াতে এসেছে সুধাময়। অনিল কাকা সুধাময়কে ঘোড়ার গাড়ি চড়াতেন, রামকৃষ্ণ মিশন রোডে মস্ত বড় এক বাড়ি ছিল অনিল কাকার— দশটি ঘোড়া ছিল বাড়িতে। সুধাময় দু'চোখ ভরে অনিল কাকার প্রাচুর্য দেখতেন। সুধাময় দত্ত এখন টিকাটুলির একটি দু'রুমের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ভাড়াবাড়িতে দিন কাটান, অথচ কাছেই নিজের কাকার বাড়ি এখন সরকারের নামে। অর্পিত সম্পত্তি আইন বদল হয়ে সম্পত্তি উত্তরাধিকার অথবা স্বগোত্রে অর্পিত হলে অনেক হিন্দুর দুর্দশা ঘুচত। সুধাময় এই প্রস্তাবটি অনেককে করেছিলেন, কাজ হয়নি। জানেন তার এই বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। তিনি এখন এই বিছানায় নিঃশব্দে মরে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। বরং নিরন্তর রাত্রি জাগরণ এবং সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব থেকে বাঁচবে কিরণময়ী। আর সুরঞ্জন, প্রখর মেধার প্রাণবান মানুষটি যে নিজেই বিষহরা মন্ত্রের কাজ করত, সে এখন নিজেই পান করছে বিষ। ও যে কেমন নীল হয়ে যাচ্ছে সুধাময় বোঝেন। সুরঞ্জন এ ঘরে কম আসে, কথা কম বলে তবু তার ওঘরে নিঃশব্দে শুয়ে থাকা, বই পোড়ানো, মুসলমানদের গালাগাল, গভীর রাতে মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢোকা, তার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ এভয়েড করা— সুধাময় বোঝেন সুরঞ্জন আসলে অভিমান করেছে খুব। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল কিছুরই ওপর তীব্র অভিমান করে সে নিজেকে পোড়াচ্ছে হীনমন্যতার অন্ধ আগুনে।

সেদিন মানিকগঞ্জ থেকে সুধাময়ের এক আত্মীয় এসেছিল, ননীগোপাল নামে সুধাময়ের এক লতায়পাতায় দাদা হয়, তার বৌ ললিতা এসেছিল দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে। বলল, সুধাময়দা এই দেশে আর থাকছি না. মেয়ে বড় হয়েছে, বড় ভয় লাগে, কখন কি

www.BDeBooks.Com

হয়। ললিতা মায়ার খবরটি জানত না। সুধাময় জানাননি, কিরণময়ীও মায়া সম্পর্কে টু শব্দ উচ্চারণ করেনি। যেন মায়া আছে, পারুলের বাড়ি, ফিরে আসবে। আসলে বাড়ির সকলের গোপনে গোপনে এই আশা থেকেই গিয়েছে যে, ধর্ষিতা নির্যাতিতা ক্ষতবিক্ষত মায়া একদিন ফিরে আসবে। ললিতা তার বড় মেয়ে অঞ্জলির নিরাপত্তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলে যাবে। কিন্তু সুধাময়ের মাঝেমধ্যে এও মনে হয় চলে গেলে কি কিছু লাভ হবে, এই দেশের রয়ে যাওয়া হিন্দুরা সংখ্যায় যদি আরও কমে যায় তবে ওদের ওপর অত্যাচার আরও বাড়বে। লাভ হবে যে যাবে তার, না কি যারা থেকে যাবে তাদের? সুধাময় অনুমান করে লাভ কারোর নয়, ক্ষতি সকলের, ক্ষতি দরিদ্রের, ক্ষতি সংখ্যালঘুদের। এতকাল পর সুধাময়ের মনে হয় যে, কিরণময়ীর ওপর তিনি আসলে অন্যায় করেছেন খুব। কিরণময়ী সুন্দরী, শিক্ষিত, রুচিবান পরিবারের মেয়ে, তাকে ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া একটি সংসারে ঢুকিয়ে পুরো একুশ বছর বঞ্চিত করেছেন। সুধাময় নিজের স্বার্থই বড় করে দেখেছেন, নয়ত তাঁর বলা উচিত ছিল কিরণময়ী তুমি বিয়ে কর, আবার সংসার কর। কিরণময়ী কি চলে যেত? মানুষের মন তো, চলে যেতেও পারত। এই ভয়ে সুধাময় কিরণময়ীর কাছাকাছি থেকেছেন বেশি, বন্ধুবান্ধবকে বাড়িতে খুব একটা ডাকতেন না। কেন ডাকতেন না, সুধাময় তাঁর অসুস্থ শয্যায় নিজের দুর্বলতাকে নিজেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন, বলেন— সুধাময়, তুমি যে নির্বান্ধব হয়ে যাচ্ছিলে ক্রমশ, ইচ্ছে করেই হচ্ছিলে, যেন তোমার বাড়িতে তোমার বন্ধুদের আড্ডা বসলে কিরণময়ীর আবার কোনও সক্ষম পুরুষকে যদি পছন্দ হয়ে যায়।

কিরণময়ীর জন্য সুধাময়ের ভালবাসা এবং বন্ধন এত তীব্র হয়ে উঠবার পেছনে ছিল স্বার্থপরতা, যেন এই তীব্রতা দেখে কিরণময়ী ভাবে যে এই ভালবাসা ছেড়ে তার কোথাও যাওয়া উচিত নয়। কেবল ভালবাসায় কি মন ভরে? এতকাল পর সুধাময়ের মনে হয় শুধু ভালবাসায় মানুষের মন ভরে না, আরও কিছুর প্রয়োজন হয়।

হায়দারের মা এক সময় খুব আসত এ বাড়িতে। হায়দারের ভাই বোনরাও আর আসত শফিক আহমেদের স্ত্রী ছেলেমেয়েরা। কিরণময়ী সামাজিকতা ভাল জানত, পাড়াপড়শি অথবা চেনাপরিচিত কেউ এলে বসাত, চা টা খাওয়াত। দুপুর বা রাত হলে ভাত মাছও খাওয়াত। ধীরে ধীরে সুধাময় লক্ষ্য করলেন হায়দারের মা, বোনরা আর আসে না। শফিক সাহেবের বাড়ি থেকেও কেউ অনেকদিন এদিকে পা বাড়ায় না। কিরণময়ী একদিন বলেছিল, শফিক আহমেদের স্ত্রী আলেয়া বেগম নাকি তাকে বলছিলেন বৌদি আপনাদের কোনও আত্মীয়টাত্মীয় থাকে না ইন্ডিয়ায়?

থাকে, আমার প্রায় সব আত্মীয়ই তো ওখানে। কিরণময়ী বলল।

তবে আর এখানে পড়ে আছেন কেন?

নিজের দেশ তো, তাই।

আলেয়া বেগমও একটু যেন অবাক হয়েছিলেন। কারণ কিরণময়ীরও যে দেশ এটি, তা যেন প্রথম তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আলেয়া যত জোর দিয়ে বলেন এটি আমার দেশ, কিরণময়ীকে তত জোর কি মানায়— আলেয়া বোধহয় ভেবেছিলেন এই কথাই। আজ সুধাময়ও ভাবেন আলেয়া আর কিরণময়ী এক নয়। মানুষ হিসেবে এক হলেও এই সমাজ তাদের এক করে দেখছে না। এই সমাজ মৌলবাদিদের দখলে চলে যাচ্ছে দিন দিন।

৫

বিরূপাক্ষ সুরঞ্জনের পার্টির ছেলে। নতুন ঢুকেছে। বেশ মেধাবী। সুরঞ্জনকে একদিন খুব মনমরা বসে থাকতে দেখে বিরূপাক্ষ বলল— আপনার এত হতাশা কেন সুরঞ্জনদা? আপনি তো আর ধর্ম মানেন না, পুজো করেন না, গরুর মাংস খান, আপনি মুসলমানদের বলেন যে আপনিও সত্যিকার হিন্দু নন। অর্ধেক মুসলমান।

আমি যে সত্যিকার মানুষ, ওদের আপত্তি তো ওখানেই। উগ্র মৌলবাদি হিন্দু ও মসুলমানে কোনও বিরোধ নেই। দেখ না এখানের জামাতের নেতার সঙ্গে ভারতের বিজেপি নেতাদের বন্ধুত্ব। দুই দেশে দুই মৌলবাদি দল ক্ষমতাবান হতে চাইছে। ভারতের দাঙ্গার জন্য দায়ি বিজেপি নয়, দায়ী কংগ্রেস একথা তো বায়তুল মোকাররমের সভায় নিজামি নিজেই বলেছে।

সুরঞ্জন দত্তের আইডিওলজির খোঁজ কেউ নেবে না। তার সুরঞ্জন দত্ত নামটির জন্যই তাকে হঠাৎ মধ্যরাতে খুন করে ফেলে রাখবে, তার বাড়িঘর লুট করবে, তার বোনকে হরণ করবে, তাকে মালাউন, শালা মালু বলে গাল দেবে, এবং তাকে ভাবতে শেখাবে যে তুমি এ দেশের মানুষ নও, তোমার আসল দেশ ইন্ডিয়া। দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে, সুতরাং ও দেশ তোমার, এ দেশ আমার।

সুরঞ্জন মাষ্টার ডিগ্রি পাশ করে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সে মাথাটা সামান্য নত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঢুকেছিল। পরে পরীক্ষকরা নাকি বলেছিলেন, ছেলেটি বড় বেয়াদব, সালাম দেয়নি। সালাম দেয়নি বলে তার চাকরিও হয়নি। সুরঞ্জনের বড় অভিমান হয়েছিল। হবেই বা না কেন? আসসলামু আলাইকুম তাকে দিতেই হবে কেন? সে যদি শ্রদ্ধা জানাবার অন্য কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করে? বাংলা ভাষায় যদি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তবে তো তার ওই দোষই ধরা হবে যে সে আসসলামু আলায়কুম বলেনি। সে ইসলামকে অবমাননা করেছে।

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জনের নিজ দেশে নিজেকে পরবাসী বলে মনে হয়। সে এই ধর্মীয় বৈষম্যের দেশে গুটিয়ে যেতে থাকে নিজের যুক্তিবুদ্ধিবিবেকসহ নিজের ভেতর। সে তার উদারতা, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদি মনকে হরতাল, কারফিউ ও সন্ত্রাসের দেশে ক্রমশ সংকুচিত করে আনে, তাকে নিঃশেষ করে আনে, সে তার দরজাজানালা বন্ধ করা ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় নিশ্বাস নেবার জন্য অমল হাওয়া পায় না। আলো পায় না সূর্যের। যেন ভয়াবহ কোনও মৃত্যুর জন্য ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। এখন আর মায়ার জন্য শোক নয়, নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য শোক করছে সবাই। তারা একা হয়ে যাচ্ছে, চেনা লোকেরা, মুসলমান বন্ধু বা পড়শি আসছে হয়ত অনেকে, কিন্তু কেউই এ কথা বলতে পারছে না, আমাদের যেমন নিশ্চয়তা আছে জীবনের, তোমাদেরও আছে। তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না, কুঁকড়ে থেক না, তোমরা নির্ভয়ে হাঁটো, হাসো, কাজ কর, ঘুমোও।

কোথায় যেন বাধে। সুরঞ্জন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা একসময় বলত। বলত এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুনাম রয়েছে। সুরঞ্জন তুলনা করে দেখত ভারতে যত দাঙ্গা হয়, এ দেশে তার কিছুই নয়, সেদিন হায়দারও একথা বলেছিল, বলেছিল—ভারতে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে, এ দেশে তো তার কছুই হয়নি। সুরঞ্জন কথাটির প্রতিবাদ করেছে, বলেছে ভারতের সঙ্গে দেশের তুলনা কেন? ভারতে দাঙ্গা হয়েছে, ভারতের মসজিদ মন্দির নিয়ে। কিন্তু এদেশের মানুষ কেন ভারতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আর তুলনাই বা হচ্ছে কেন?

ধর্মীয় বৈষম্য এই দেশে এত বেশি, তবু কেন বড় বড় নেতারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে সুরঞ্জন বুঝতে পারে না। জাতীয় সংসদে ১৯৫৪ সালে মোট সদস্য ছিল তিনশ' নয়জন, আর সংখ্যালঘু ছিল বাহাত্তর জন। ১৯৯১ সালে মোট সদস্য তিনশ' পঁয়তাল্লিশ জন, আর সংখ্যালঘু হচ্ছে বারো জন। সেনাবাহিনীতে কোনও সংখ্যালঘু ব্রিগেডিয়ার মেজর জেনারেল নেই। কর্ণেল সত্তর জনে একজন, লেফটেনেন্ট কর্ণেল চারশ' পঞ্চাশ জনে আট জন, মেজর একহাজার জনে চল্লিশ জন, ক্যাপ্টেন তেরশ' জনে আটজন, সেকেন্ড ফেলটেনেন্ট নয়শ জনে তিনজন, সিপাহী আশি হাজারে মাত্র পাঁচশ' জন। চল্লিশ হাজার বিডিআরের মধ্যে হিন্দু মাত্র তিনশ' জন। সচিবালয়ের অবস্থা আরও করুণ। কোনও হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান সচিব বা অতিরিক্ত সচিব পদে নেই। যুগ্মসচিব আছেন একশ' চৌতিরিশ জনে মাত্র তিন জন, আবগারি ও শুল্ক কর্মকর্তা একশ' বাহান্ন জনে একজন, আয়কর কর্মকর্তা সাড়ে চারশ'র মধ্যে আটজন। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোয় প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ছেচল্লিশ হাজার আটশ চুরানব্বই এর মধ্যে আছে সাড়ে তিনশ' জন। পুলিশ বাহিনীতে আশি হাজার পুলিশের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মাত্র দুই হাজার। অতিরিক্ত আইজি কেউ নেই, আইজিও নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলোয় কর্মকর্তা শতকরা এক ভাগ, কর্মচারী তিন থেকে চার ভাগ, শ্রমিক এক ভাগেরও নিচে। শুধু তাই

নয়, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংকে কোনও এম ডি নেই হিন্দু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্টর হিন্দু কেউ নেই, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী, শিল্প ও কৃষি ব্যাংকের কোনও ডাইরেক্টর হিন্দু নেই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায় তবে সংখ্যালঘুদের মানসিক নিরাপত্তা অর্জন করা খুব কঠিন হবে, শুধু মানসিকই নয়, শারীরিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে।

রত্নার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। রত্না কেমন আছে, রত্না কি সুরঞ্জনকে বিয়ে করতে চাইবে? সুরঞ্জনের বিশ্বাস হয় রত্না একদিন হঠাৎ এক বিষণ্ন বিকেলে সুরঞ্জনদের টিকাটুলির বাড়িতে উপস্থিত হবে, বলবে কেমন জানি খালি খালি লাগে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন চোখ বুজে টের পায় তার ঘর্মাক্ত কপালে একটি কতরল এসে থামল, স্পর্শ করল। সুরঞ্জনকে কেউ খুব আদর করে স্পর্শ করেনি কখনও, পারভিন ছাড়া। এবার ও এ বাড়িতে আসেনি। মুসলমান ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে ঝুটঝামেলা নেই, তাই ঝুটঝামেলাহীন জীবন সে বেছে নিয়েছিল, জীবনে যা কিছু ঘটুক, এ কথা তো মিথ্যে নয় যে পারভিন তাকে চুমু খেত, সে পারভনিকে জড়িয়ে ধরে বলত তুই একটা পাখি, চড়ুই পাখি। পারভিন হেসে গড়িয়ে পড়ত, বলত তুই একটা বানর। কিরণময়ী হঠাৎ হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে দুজনই বিযুক্ত হত। কিরণময়ী আশ্চর্য এক মানুষ, সে বিরক্তি প্রকাশ করেনি কখনও। পারভিনকে সে নিজেও বড় স্নেহ করত। সুরঞ্জন তার পরিচিত আর সব হিন্দু পরিবারের মানসিকতা বিচার করে দেখেছে যে তার পরিবারই ছিল সবচেয়ে বেশি নন-কম্যুনাল।

রত্না মিত্রর কথা সুরঞ্জন গভীর করে ভাববার প্রস্তুতি নিচ্ছে যখন, তখনই দরজায় টোকা পড়ে, সুরঞ্জন দরজা খুলে দেখে রত্না দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে গুছিয়ে বসুন, বসুন বলতেই রত্নার পেছনে সুরঞ্জন লক্ষ্য করে সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক। রত্না পরিচয় করিয়ে দেয়— ওর নাম হুমায়ুন, আমার বর।

সুরঞ্জনের বুকের মধ্যে মুহূর্তে একটি সমুদ্র গর্জে ওঠে। ঝড় হয়, ঘূর্ণিঝড়। জীবনের অনেকটা বছর হেলায় হারিয়ে বাকি জীবনে রত্নাকে নিয়ে তার বড় সংসার করবার স্বপ্ন ছিল। আর রত্না কি না মুসলমান বর নিয়ে হাসতে হাসতে দাঙ্গাকবলিত দেশে বেঁচে থাকবার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুরঞ্জন, তার এলোমেলো দরিদ্র ঘরটিতে রত্না এবং তার স্বামীকে বসিয়ে ভাল মানুষের মত এখন ভাল ভাল কথা বলবে, হুমায়ুনের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করবে, চা খেতে দেবে, বলবে আবার আসবেন! না সুরঞ্জন এসব কিছুই করবে না। এসব তার করতে ইচ্ছে করছে না। সে রত্নাকে হঠাৎ বলে, আমি খুব জরুরি কাজে এখন বেরোচ্ছি বাইরে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। অতিথি দুজনের মুখ অপমানে লাল হয়ে ওঠে। তারা 'দুঃখিত' বলে বেরিয়ে যায়। সুরঞ্জন দরজা বন্ধ করে দরজার দিকে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তার

www.BDeBooks.Com

সম্বিৎ ফেরে কিরণময়ী ঘরে ঢুকে সুরঞ্জনের টেবিলের পাঁচ হাজার টাকা রেখে যখন বলল, এই টাকার দরকার হবে না। যার কাছ থেকে ধার করেছিস, দিয়ে দিস। ধার শব্দটি তীরের মত এসে বিঁধল সুরঞ্জনের মনে। সে কিরণময়ী ক্লান্ত নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকাল শুধু, কিছু বলল না।

•

সুরঞ্জনের কোথাও যাবার নেই। পুলকের কাছে এই টাকা কটি ফেরত দিলে সুরঞ্জন দায়মুক্ত হবে। পুলকের কাছেও তার যেতে ইচ্ছে করে না। সুরঞ্জনের হঠাৎ এই ঘরে বড় দম বন্ধ লাগে। সে বারান্দায় কিছুক্ষণ উদাসিন হাঁটে। কিরণময়ী নিঃশব্দে এক কাপ চা রেখে যায়। সুরঞ্জনের টেবিলে। সুরঞ্জন খেয়াল করে, কিন্তু চায়ের দিকে হাত বাড়ায় না। সুধাময় অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করেন, কিরণময়ী কিরণময়ী বলে ডাকেন। বাড়িটি নিস্তব্ধতার জলে ডুবে থাকে। জলের ভেতর দু'একটি জলপোকা যেমন নিঃশব্দে চলে, নিস্তব্ধতার মধ্যে বাড়ির তিনটি প্রাণী তেমনি জলপোকার মত হাঁটে, কেউ কারও পদশব্দ শুনতে পায় না। হঠাৎ এই ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয় কিরণময়ী। কোনও কারণ নেই, কিছু নেই, সুরঞ্জনকে সে কিছুক্ষণ আগে এক কাপ চা দিয়েছে— সে কেঁদে ওঠে, তার তীব্র কান্নার শব্দে সুধাময় চকিতে উঠে বসেন, সুরঞ্জন ছুটে আসে কিরণময়ী ঘরের দেওয়ালে মাথা রেখে যখন কাঁদছে, সুরঞ্জনের সাহস হয় না এই কান্না থামাতে, সুধাময়েরও হয় না। দুজনই স্থির হয়ে, নত হয়ে এই কান্নার প্রতিটি স্বর এবং হাহাকার উপলব্দি করে। সুরঞ্জন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিরণময়ীর কান্না তখনও থামেনি, সুরঞ্জন চেঁচিয়ে বলে, বাবা আমি কাল সারারাত একটি কথা ভেবেছি, তোমাকে বলবার সাহস পাচ্ছি না, তুমি আমার কথা রাখবে না জানি। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমার কথা রাখ। চল আমরা চলে যাই।

কোথায়? সুধাময় জিজ্ঞেস করেন।

ইন্ডিয়া।

ইন্ডিয়া?

কিরণময়ীর কান্না ধীরে ধীরে থেমে আসে। দীর্ঘ কান্নার রেশে তার শরীর দুলে দুলে গোঙাতে থাকে। সুধাময় শুয়ে শুয়ে তাঁর কোথায় কত টাকাপয়সা আছে হিসেব করছিলেন; কারণ বাড়িঅলাকে টাকা দিতে হবে, চার মাসের ভাড়া বাকি। সুধাময় কাগজকলম গুটিয়ে বললেন, ইন্ডিয়া তোর বাবার বাড়ি না তোর দাদার বাড়ি? তোর চৌদ্দ গোষ্ঠির কার বাড়ি ইন্ডিয়া যে ইন্ডিয়া যাবি?

দেশ ধুয়ে জল খাব বাবা? এই বাড়ি, এই শেকড় কি দিচ্ছে আমাদের? ইন্ডিয়ায় হিন্দুদের বাড়ি। যত নাস্তিকই হই আমরা, যত উদারপন্থী হই, যত বড় মহামানবই হই, লোকে আমাদের হিন্দুই বলবে, মালাউনই বলবে, এই দেশকে যত আপন ভাবব, এই

দেশ তত দূরে সরবে। মানুষকে যত বেশি ভালবাসব, মানুষ তত আমাদের একঘরে করবে। এদের বিশ্বাস নেই বাবা। তুমি তো অন্তত একশ জন মুসলমান পরিবারকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা কর। এই দুর্যোগের দিনে কয়জন তোমার পক্ষে দাঁড়িয়েছে? এদেশে কত পার্সেন্ট মানুষ ধর্মীয় বৈষম্য দূর করতে চায়? বাবা চল চলে যাই।

সুধাময় বললেন, মায়াকে রক্ষা করা যদি গেল না, কাকে রক্ষা করতে যাব তবে?

নিজেদের। যেটুকু হারিয়েছি, সেটুকুর জন্য শোক করবার জন্য এখানে বসে থাকব? এই ভয়ংকর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে? তার চেয়ে চল চলে যাই।

ওখানে কি করব?

ওখানে যা হোক কিছু করব। এখানেই বা কি করছি। খুব কি ভাল আছি আরাম খুব সুখে?

শেকড়হীন জীবন......

শেকড় দিয়ে কি করবে? শেকড় দিয়ে যদি কিছু হতই তবে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হয় কেন? সারাজীবন এরকম কুনো ব্যাঙের জীবন কাটাতে হবে। এরা কথায় কথায় আমাদের বাড়িঘরে হামলা করবার, আমাদের জবাই করে ফেলবার অভ্যেস রপ্ত করে ফেলেছে। এরকম ইঁদুরের মত বেঁচে থাকতে আমার লজ্জা হয় বাবা। চল চলে যাই।

এখন তো অনেকটা শান্ত হয়েই আসছে পরিস্থিতি।

সব ওপরে ওপরে। ভেতরে হিংস্রতা আছেই, ভেতরে ভয়ংকর দাঁতনখ বের করে ওরা ফাঁদ পেতে আছে। তুমি ধুতি ছেড়ে আজ পাজামা পর, কেন পর, কেন তোমার ধুতি পরবার স্বাধীনতা নেই? চল চলে যাই।

না। আমি যাব না। তোর ইচ্ছে হয়, তুই চলে যা।.

যাবে না তুমি?

সুধাময় চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল— না।

কিরণময়ীর কান্না থেমে গেছে। সে ঝুঁকে আছে একটি রাধাকৃষ্ণের ছবির সামনে। এর আগে সুরঞ্জন একটি গণেশের মূর্তি দেখেছিল ঘরে, কিরণময়ী লুটিয়ে পড়েছিল তার সামনে। সেই মূর্তিটি মুসলমানেরা ভেঙে ফেলেছে। গোপনে কোথাও হয়ত কিরণময়ী রাধাকৃষ্ণের এই ছবিটি রেখেছিল, এখন এটি বের করে সে ঝুঁকে থাকে, ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে নিরাপত্তার নির্ভাবনার নিশ্চয়তার, নিরুপদ্রব জীবনের।

সুরঞ্জন ব্যর্থ হয়, সে জানত সে ব্যর্থ হবে। সুধাময়ের মত কঠিন চরিত্রের মানুষটি লাথিঝাটা খেয়েও মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। মাটির সাপ বিচ্ছুরা তাকে কামড়াবে, তবু সে মাটিতেই কামড় দেবে, মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

www.BDeBooks.Com

সুরঞ্জন আশাহীনতার অন্ধকারে একা একা সাঁতরায়। রাত হয়, রাত গভীর হয়। তার জন্য এখন পুলক, হায়দার, কামাল, অসীম, লুৎফর, কাজল— কেউ সহায় নয়। তার জন্য শেষ রক্ষক যে সুধাময় ছিলেন, সুধাময়ও অবশিষ্ট নেই আর। সুরঞ্জন একা হয়ে যায়। মসজিদের আযান ভেসে আসে, একটি দুটি তিনটি চারটি মাইকের আযান একসঙ্গে ধ্বনিত হয়। সুরঞ্জন ছোটবেলার মুখস্থ করা বিদ্যে বিড় বিড় করে বলে, স্বরে অতে অযু কর সকালবেলা, স্বরে আতে আযান......। সারারাত ছটফট করে সুরঞ্জন নিদ্রাহীনতায়, আর তার মনে পড়ে পণ্ডিতমশাই একদল ছাত্রকে বেত সামনে নিয়ে পড়াতেন অযু কর সকালবেলা......

৬

শেষ রাতের দিকে ঘুম পায় সুরঞ্জনের। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক দুঃস্বপ্ন দেখে সে। একা একটি নদীর পাড়ে সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখে নদীর একটি ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে গভীরে, সে পাকে পড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জনের সারা শরীর ঘামতে থাকে। সে তলিয়ে যেতে থাকে ফুঁসে ওঠা অচেনা জলে। সুরঞ্জনের এমন অস্থির সময়ে একটি শান্ত স্থির হাত সুরঞ্জনকে স্পর্শ করে, জাগায়। সুরঞ্জন ধড়ফড় করে উঠে বসে। ভয়ে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। পাক খাওয়া জল তাকে ডুবিয়ে নিচ্ছিল, বাঁচবার জন্য সে প্রাণপণ চিৎকার করছিল, একটি খড়কুটোও আঁকড়ে ধরবার জন্য যেমন সে হাত বাড়াচ্ছিল স্বপ্নের মধ্যে, সুরঞ্জন তেমন আঁকড়ে ধরে সুধাময়ের হাত। সুধাময় এসে বসেছেন সুরঞ্জনের বিছানায়।

সুধাময় কিরণময়ীর কাঁধে ভর রেখে রেখে হেঁটে এসেছেন। অল্প অল্প শক্তি ফিরেছে তার শরীরে। কিরণময়ী সুধাময়কে ধরে রাখে দু'হাতে।

বাবা? সুরঞ্জন আর কোনও কথা বলতে পারে না। একটি বোবা জিজ্ঞাসা সুরঞ্জনের মুখে। তখন ভোর হচ্ছে। জানালার দুটো তিনটি ছিদ্রপথে আলোর মুখ দেখা যায়। সুধাময় বলেন, সুরঞ্জন চল আমরা চলেই যাই।

অবাক হয়ে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাব বাবা?

সুধাময় বলেন—ইন্ডিয়া।

সুধাময়ের বলতে লজ্জা হয়, তাঁর কণ্ঠ কাঁপে, তবু তিনি চলে যাবার কথা বলেন; কারণ এতদিনে তার ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টিও দিনে দিনে ধসে পড়েছে।

---

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

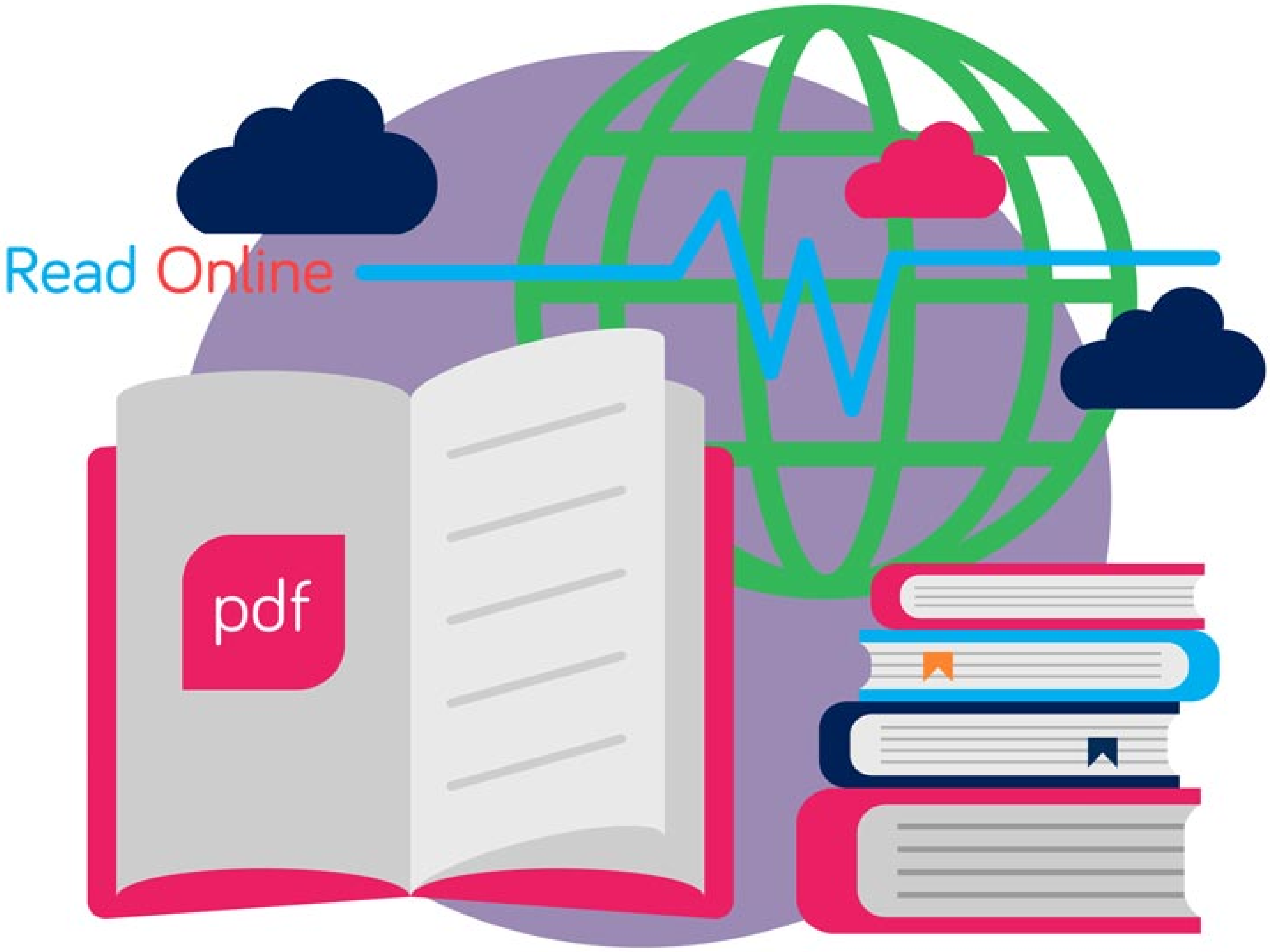

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com